তুহফাতুল হাদীস

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

Android এবং iPhone দিয়ে

ইসলামী যিন্দেগী

App ইন্সটল করুন

প্রথম প্রকাশ: শাবান-১৪৩৫ হিজরী
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: রজব-১৪৩৭ হিজরী

তুহফাতুল হাদীস
মুফতী মনসূরুল হক
প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
০১৬৮১১৯৮৩৮১
সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ঢাকা
০১৯১৪৭৩৫৬১৫

মাকতাবাতুল হেরা
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
দোকান নং-৩, বাংলাবাজার ঢাকা
৮২/১২এ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
০১৯৬১৪৬৭১৮১

মূল্য : ১৬০ টাকা

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

ভূমিকা

ভারতবর্ষ মাযহাবপন্থী মুসলমানদের আবাসভূমি। এ অঞ্চলের মুসলমানগণ মাযহাব মেনে ইসলাম পালনে অভ্যস্ত এবং প্রায় ৯০ শতাংশই হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে। ১২৪৬ হিজরী পর্যন্ত চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাব মানে না এমন মুসলমানের অস্তিত্ব এদেশে পাওয়া যায় না। ১২৪৬ হিজরীতে মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী ইংরেজদের পরোক্ষ মদদে মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ফিরকা আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে হুসাইন আহমাদ বাটালবী এই ফেতনাকে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে আরো চাঙ্গা করেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে লা-মাযহাবিয়্যাতের ফেতনা চরম আকার ধারণ করেছে। যুগে যুগে উলামায়ে কেরামই নব-উদ্ভাবিত সমস্ত ফেতনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। একজন নায়েবে নবী হিসাবে চলমান এই ফেতনা সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদেরকে সতর্ক করা আমি আমার দায়িত্ব মনে করি। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তারা যেসব মাসআলা নিয়ে ফেতনা করে থাকে, সেসব মাসআলা পারচা আকারে তৈরি করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি। বক্ষ্যমান গ্রন্থটি সেই পারচাসমূহেরই সংকলন। গ্রন্থে প্রথমত হানাফী মাযহাবের দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত লা-মাযহাবীদের দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, তৃতীয়ত তাদের দলীল খণ্ডন করে তাদের ভ্রষ্টতা প্রমাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, লা-মাযহাবীদের অনেক দলীল চার মাযহাবের কোনো-না-কোনো মাযহাবে হুবহু পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি ঐসব মাযহাবের অনুসারীরাও ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে? এর উত্তর হলো, যারা কোনো মুজতাহিদের মাযহাব অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের উপর আমল করবে তারা ভ্রষ্ট বিবেচিত হবে না। কারণ সাধারণদের দায়িত্ব হল মুজতাহিদের কাছে জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করা (সূরা নাহল:১৬)। আর মুজতাহিদ ইজতিহাদ করতে গিয়ে কোনো ভুল করলে তার কোনো পাপ হয় না (আল ওরাকাত ফিল উসূল পৃ.৬৫)। বরং ভুল করলেও একটি সাওয়াব হয়, আর ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে দুইটি সাওয়াব হয়। (বুখারী হা.২৩১) সুতরাং মাযহাবী মুসলমানরা মাযহাব মানতে গিয়ে ভ্রষ্টতার শিকার হবে না। আর লা-মাযহাবীরা যেহেতু কোনো মুজতাহিদকে মানে না, আর নিজেরাও তারা মুজতাহিদ নয়, তাই অনধিকার চর্চার অপরাধে তারা ভ্রষ্ট বিবেচিত হবে। তাদের

উদাহরণ, হাতুড়ে চিকিৎসকের ন্যায়। যার ভুল চিকিৎসায় রোগী মারা গেলে এর দায়ভার তাকেই বহন করতে হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবটি প্রকাশের এই শুভক্ষণে আমি আমার ঐসব শাগরিদদের বিশেষভাবে স্মরণ করছি যারা কিতাবের 'মাওয়াদ' সংগ্রহে আমাকে সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে তাদেরকে কামিয়াব করুন।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই নির্ভুল করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ কোনো পাঠক যদি কোনো ভুলের ব্যাপারে অবহিত করেন, তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবের মাধ্যমে আম-খাস সবাইকে সমান উপকৃত করুন এবং এই মেহনতের উসীলায় লা-মাযহাবীদের ফেতনার দ্বার বন্ধ করে দিন। আমীন।

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

বেশ কিছুদিন যাবত 'তুহফাতুল হাদীস' কিতাবখানি বাজারে নেই। চারদিক থেকে তাকাদা করা হচ্ছিলো দ্রুত প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে দেরি হয়ে গেলো। আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবখানি আহলে হাদীস ফিরকার ফিতনাসমূহ ও প্রকৃত অবস্থা মুস্লিম জনগণকে অবহিতকরণে ভূমিকা রাখতে পেরেছে। প্রথম প্রকাশে বেশকিছু ভুল-ত্রুটি ও কমতি ছিলো। এবার চেষ্টা করা হয়েছে ভুলগুলো সংশোধন ও কিছু বিষয় সংযোজন করে কিতাবটির মান বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলের জানার পরিধি বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটু পানি সিঞ্চনের জন্য। নিঃসন্দেহে লা-মাযহাবী ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রকৃত অবস্থা প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন।

পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি, মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। তাই নির্ভুল করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল থেকেই যায়। বিজ্ঞ কোনো পাঠক ভুল চিহ্নিত করে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের উসীলায় তথাকথিত আহলে হাদীস ফিরকার ফিতনাসমূহ চীরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিন। আমীন।

বিনীত
মুফতী মনসূরুল হক

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১. মুসল্লীগণ নামাযে কীভাবে দাঁড়াবেন?	৯
২. টাখনু ও কাঁধ বরাবর করে কাতার	৯
৩. নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা সুন্নাত	১৫
৪. হাত বেঁধে নাভির উপর রাখা	১৬
৫. বুকের উপর হাত বাঁধা	২১
৬. নামাযে একাধিকবার রফয়ে ইয়াদাইন (হাত উঠানো)-এর বিধান	২৬
৭. ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান	৩৯
৮. সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' আস্তে বলা সুন্নাত	৪৭
৯. রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত	৫৭
১০. প্রসঙ্গঃ বিতর নামায	৬২
১১. এক সালামে তিন রাকা'আত	৬৭
১২. তৃতীয় রাকা'আতে রুকূর আগে দু'আয়ে কুনূত	৭৪
১৪. শর'ঈ প্রমাণপত্রের আলোকে তারাবীহের রাকা'আত সংখ্যা	৯৪
১৫. রাকা'আত তারাবীহ-এর দলীলসমূহ নবীযুগে তারাবীহ	৯৮
১৬. খিলাফতে রাশেদার যুগে তারাবীহ	৯৯
১৭. সাহাবায়ে কিরামের তা'আমুল ও ইজমা	১০৪
১৮. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাযা নামায পড়ার বিধান	১১৪
১৯. ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলীল	১১৯
২০. জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান	১৩৩
২১. মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন	১৪২
২২. জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ শরী'আত কী বলে?	১৪৯
২৩. ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার শর'ঈ বিধান	১৫৩
২৪. এক মজলিসে বা একসাথে তিন তালাকের শর'ঈ বিধান	১৬৩
২৫. আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরয	১৭২
২৬. হাদীস নাকি সুন্নাহ: কোনটি অনুসরণ করবো?	১৭৯

باسمہ تعالی

মুসল্লীগণ নামাযে কীভাবে দাঁড়াবেন?

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করাকে শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, একদিকে জামা'আতে নামায আদায়কারীর জন্য যেমন ঘোষিত হয়েছে মহাপুরষ্কার, অন্যদিকে জামা'আত তরককারীর জন্য এসেছে মহাশাস্তির ঘোষণা। আর জামা'আতে নামায আদায়কালে কাতারের মধ্যে পরস্পরের টাখনু ও কাঁধ বরাবর করে কাতার সোজা করার প্রতি দেয়া হয়েছে নিরন্তর তাকাদা। কিন্তু লা-মাযহাবী বন্ধুরা নিজে নিজে হাদীস বুঝার মূল্য হিসেবে কাতার সোজা করার হাদীসগুলির ক্ষেত্রে ভুল অনুভবের শিকার হয়েছেন। তারা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ ধরে পরস্পরের টাখনুর সাথে টাখনু লাগাতে গিয়ে যে অস্বাভাবিক, অনাকাঙ্ক্ষিত ও খুশু-খুজু বিনষ্টকারী অবস্থার অবতারণা করেন তা খুবই আশ্চর্যজনক; যা গোটা মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে 'বিচ্ছিন্ন ও অসমর্থিত' পদ্ধতি।

এযাবতকালের মুসলিম উম্মাহর সুন্নাহ-সম্মত অবিচ্ছিন্ন আ'মলী পদ্ধতি হলো, কাতারের মাঝে ফাঁক না রেখে পরস্পরের টাখনু ও কাঁধ বরাবর করার মাধ্যমে কাতার সোজা করা। নিম্নে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পেশ করা হচ্ছে:

টাখনু ও কাঁধ বরাবর করে কাতার সোজা করার দলীলসমূহ

হাদীস-১: হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. رواه الترمذى (٢٢٨)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন। একদিন কাতার সোজা করতে বের হয়ে দেখলেন, একজনের বুক অন্যদের থেকে সামনে বের হয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, হয় তোমরা কাতার সোজা করবে আর নয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। (তিরমিযী হা. নং. ২২৮)

হাদীস-২: হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রা. বলেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ»، قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟، قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» رواه أبو داود (661)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি সেভাবে সারিবদ্ধ হবে না যেভাবে ফিরিশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? আমরা বললাম, ফিরিশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সামনে কীভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তারা সামনের কাতার আগে পুরা করে এবং কাতারে মিলে মিলে একে অপরের বরাবর হয়ে দাঁড়ায়। (আবূ দাউদ হা. নং. ৬৬১)

হাদীস-৩: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ». رواه أبو داود (666)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাতার সোজা করো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাঁধ অন্যের কাঁধ বরাবর করো। কাতারের মধ্যকার ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াও। তোমাদের ভাইদের হাতে (যারা নামাযের প্রশিক্ষণ দেন, বা কাতার সোজা করেন) নরম হয়ে যাও। কাতারের মাঝে শয়তানের জন্য ফাঁক রেখো না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা তার সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (আবূ দাউদ হা. নং ৬৬৬)

হাদীস-৪: হযরত উমর ফারুক রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالاً بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَلاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ.

رواه الترمذى تحت رقم (227)

অর্থ: হযরত উমর ফারুক রা. কয়েকজন ব্যক্তিকে কাতার সোজা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। আর কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীর বলতেন না। (তিরমিযী হা. নং ২২৭-এর অধীনে)

হাদীস-৫: হযরত 'উসমান ও আলী রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ: اسْتَوُوا ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ. رواه الترمذى تحت رقم (227)

অর্থ: হযরত 'উসমান ও আলী রা. কাতার সোজা করার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। তারা বলতেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। আর হযরত আলী রা. (এটাও) বলতেন, হে অমুক! সামনে বাড়ো, হে অমুক! পিছনে সরো। (তিরমিযী হা. নং ২২৭-এর অধীনে।)

উপরোল্লিখিত হাদীস ও আসারের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে কাতার সোজা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এর পদ্ধতি হলো, কেউ কাতার থেকে আগে-পিছে দাঁড়াবে না, বরং সবাই পরস্পরের টাখনু ও কাঁধ বরাবর করে মিলে মিলে দাঁড়াবে। কাতারের মাঝে একজন লোক দাঁড়াতে পারে এমন কোনো ফাঁক রাখবে না।

কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে এটিই সুন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি ও উম্মতে মুহাম্মাদীর ধারাবাহিক আমল। নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম করা দীনের ক্ষেত্রে 'নতুন আবিষ্কার ও সুন্নাতের বরখেলাফ'।

লা-মাযহাবীদের উপস্থাপিত দলীল ও সেগুলোর পর্যালোচনা

লা-মাযহাবীরা দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা.-এর হাদীসটি; যা ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীতে, **بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ**

(পরিচ্ছেদ: কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখা) শিরোনামের অধীনে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, **«رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ»**

অর্থ: আমাদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে তার সাথীর টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। (উল্লেখ্য, হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বানসহ অনেকেই সনদসহ উল্লেখ করেছেন)

তারা আরেকটি হাদীস পেশ করে থাকে, যা হযরত আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ». – رواه البخارى (725)

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমরা কাতার সোজা করো। আমি তো তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকে দেখতে পাই’। হযরত আনাস রা. বলেন, আমাদের লোকেরা একে অন্যের কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন। (বুখারী হা. নং ৭২৫)

লা-মাযহাবীরা বলেন, এসব হাদীস থেকে ধারণা হয়, মুসল্লীগণ পরস্পরের টাখনু ও কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ ব্যাখ্যা কেবল তাদেরই মনগড়া ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ:

১. আবূ দাউদ শরীফে একটি হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ». رواه أبو داود (654)

অর্থ: তোমরা নামায আদায়কালে তোমাদের ডান পায়ের পাশে জুতা রাখবে না (কারণ সেখানে ফিরিশতাগণ থাকেন) এবং তোমাদের বাম পায়ের পাশেও রাখবে না, কারণ সেটা অন্য ভাইয়ের ডানপাশ। তবে বামপাশে কেউ না থাকলে সেখানে জুতা রাখতে পারবে। (আবূ দাউদ হা. নং ৬৫৪)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দুই মুসল্লীর পায়ের মাঝখানে ফাঁক থাকবে, যেখানে জুতা রাখা সম্ভব। কিন্তু উপরে বর্ণিত কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে জুতা রাখতে নিষেধ করেছেন। দু’জনের পায়ের মাঝখানে যদি ফাঁকই না থাকে (যেমনটি আহলে হাদীস বন্ধুগণ করে থাকেন), তাহলে-তো জুতা রাখতে নিষেধ করার কোনো মানেই হয় না।

২. লা-মাযহাবীদের অনুসৃত পন্থাটি এ যাবতকালের গোটা মুসলিম উম্মাহর কর্মপদ্ধতি বিরোধী ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পথ। আর গোটা মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন পথ ও মত অবলম্বন করার অর্থ হলো জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা। এ বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নের হাদীসটি লক্ষ্য করুন:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ. رواه الترمذى (2167)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপর একত্রিত করবেন না। আর আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য তো জামা‘আতের সাথেই। যে বিচ্ছিন্ন পথ ও মত অবলম্বন করলো, সে-তো জাহান্নামের পথ অবলম্বন করলো। (তিরমিযী হা. নং ২১৬৭)

৩. সাহাবী নুমান ইবনে বাশীর রা. ও আনাস রা.-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف و سد الخلل

অর্থ: এখানে ‘এলযাক’ বা পা মিলানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাতার সোজা করা ও ফাঁকা জায়গা পূরণ করার ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া। (ফাতহুল বারী: ২/২৬৮, হা. নং ৭২৫)

৪. হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সঠিক ও যৌক্তিক। কেননা সুনানে আবূ দাউদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সুনানে দারাকুতনী; হাদীসের বিখ্যাত এ তিন কিতাবে নুমান ইবনে বাশীর রা.-এর উক্তিটি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব কিতাবে উক্তিটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে:

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ . أبو داود (662)، ابن خزيمة (160) ، الدارقطني (1093)

অর্থ: আমি লোকদেরকে কাঁধের সাথে কাঁধ, হাটুর সাথে হাঁটু ও টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াতে দেখেছি।

তাছাড়া সুনানে নাসাঈ-এর এক সহীহ হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (815) رواه النسائي – وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ.....

‘.....তোমরা একে অন্যের ঘাড় বরাবর করে দাঁড়াও’। (সুনানে নাসাঈ হা. নং ৮১৫)

একথা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাঁটুর সাথে হাঁটু ও ঘাড়ের সাথে ঘাড় লাগিয়ে দাঁড়ানো একেবারেই অসম্ভব। যে কেউ তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

সুতরাং বোঝা গেলো, হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. ও হযরত আনাস রা.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো কাতারের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা পূরণ করা ও কাতার সুন্দরভাবে সোজা করার প্রতি জোর তাগিদ দেয়া। পাশাপাশি ব্যক্তিদের হাঁটু বা টাখনু লাগিয়ে রাখা উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। অর্থাৎ, উক্ত হাদীসসমূহে ‘শাব্দিক অর্থ’ উদ্দেশ্য নয়; বরং বরাবর করে দাঁড়ানো মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে দীনের সহীহ বুঝ এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা সুন্নাত

নামাযে বাম কব্জির উপর ডান হাত রেখে দু’আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরা সুন্নাত। এ আমলটি একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, চার মাযহাবের ইমামগণই এই পদ্ধতিটিকে সুন্নাতরূপে গ্রহণ করেছেন।

নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ:

(১) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন:

«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ : أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاَةِ»

অর্থ: লোকদেরকে এই আদেশ দেওয়া হত যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে। (বুখারী হা.৭৪০, মুসনাদে আহমাদ হা.২২৯১৫)

(২) হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন :

قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

অর্থ: আমি মনে মনে বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ভাবে নামায পড়েন তা আমি লক্ষ্য করবো। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। অতঃপর তার ডান হাত বাম হাতের কব্জি ও কব্জি-সংলগ্ন বাহুর উপর রাখলেন। (নাসাঈ: ৮৮৯, আবূ দাউদ: ৭২৬-৭২৭, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩১৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৪৮০)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল: উল্লেখিত হাদীসে ডান হাতের একটি অংশ (অর্থাৎ হাতের তালু) আর বাম হাতের তিনটি অংশ (অর্থাৎ, তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহু)-এর কথা বলা হয়েছে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ডান হাতের তালুকে বাম হাতের পিঠের উপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কব্জি ধরবে এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জি-সংলগ্ন বাহুর উপর প্রসারিত করে দিবে। এ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ওয়াইল ইবনে হুজর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরার সুন্নাত পদ্ধতিটি মনোযোগের সাথে খেয়াল করে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায় সহীহ ইবনে খুযাইমায়। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা রহ. (২২৩-৩১১হি.)-যিনি সোনালি যুগের একজন মুহাদ্দিস, তিনি তার গ্রন্থে উক্ত হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন:

بَابُ وَضْعِ بَطْنِ الْكَفِّ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ جَمِيعًا

অর্থাৎ: 'ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর একই সাথে রাখবে'। (আর এটা উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া সম্ভব নয়।)

অনুরূপ বর্ণনা সুনানে দারেমীতে সহীহ সনদে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَرِيبًا مِنَ الرُّسْغِ

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডান হাত বাম হাতের উপর কব্জির কাছে রাখতে দেখেছি। (সুনানে দারেমী:হা.১২৩৯)

(৩) হযরত হুলব আত তায়ী রা. বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে চেপে ধরতেন। (তিরমিযী:হা.২৫২, ইবনে মাজা:৮০৯, ইবনে আবী শাইবা:৩৯৫৫) এখানে বাম হাতের কনুই ধরার কথা বলা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন:

حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

হযরত হুলব থেকে বর্ণিত হাদীসটি ‘হাসান’, এই হাদীসের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাবেঈন এবং পরবর্তী সকল আহলে ইলমের আমল। তারা নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন, কেউ নাভির উপর রাখা পছন্দ করতেন, আবার কেউ নাভির নিচে রাখা পছন্দ করতেন। তাঁদের নিকট উভয়টারই ব্যাপকতা ছিলো।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, পুরুষদের কেউ বুকের উপর হাত রেখেছেন এমন কোনো প্রমাণ কারও থেকেই পাওয়া যায় না।

(৪) হযরত শাদ্দাদ ইবনে শুরাহবিল রা. বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا؛ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى قَابِضًا عَلَيْهَا، يَعْنِي: فِي الصَّلاَةِ.

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দণ্ডায়মান দেখলাম। তিনি নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাতটিকে চেপে ধরে আছেন। (এটি

‘মুসনাদে বাযযার’ কাশফুল আসতার হা.নং ৫২২, ‘তাবারানী’ কাবীর হা. সং ৭১১১)

এ হাদীসেও ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরার কথা বলা হয়েছে। এক হাতের বাহু আরেক হাতের বাহুর উপর রাখার কথা বলা হয়নি।

(৫) হযরত জারীর আদ্দাবী বলেন:

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ

অর্থ: হযরত আলী রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:হা. ৩৯৬৯)

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে যা বুঝা যায়, তা হলো:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন।

২. ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে চেপে ধরতেন।

৩. বাম হাতের কব্জি চেপে ধরতেন।

যার ফলে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ উপরোল্লিখিত সবগুলোই একসাথে আমল করে থাকেন এবং সেই পদ্ধতিকেই অধিকাংশ মাযহাবের আলেমগণ অবলম্বন করেছেন।

হালবী রহ. মুনইয়াতুল মুসল্লী-এর শরাহ্ ‘গুনইয়াতুল মুতামাল্লী’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:-

السُّنَّةُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْوَضْعِ وَ الْقَبْضِ جَمْعًا بَيْنَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرَةِ إِذْ فِيْ بَعْضِهَا: ذِكْرُ الأَخْذِ وَ فِيْ بَعْضِهَا: ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ وَ فِي الْبَعْضِ: ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الذِّرَاعِ، فَكَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ أَنْ يَضَعَ كَفَّ الْيُمْنٰى عَلَى كَفِّ الْيُسْرٰى وَ يُحَلِّقُ الإِبْهَامَ وَ الْخِنْصَرَ عَلَى الرُّسْغِ وَ يَبْسُطَ الأَصَابِعَ الثَّلَاثَةَ عَلَى الذِّرَاعِ، فَيَصْدُقُ أَنَّه وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْيَدِ وَ عَلَى الذِّرَاعِ وَ أَنَّه أَخَذَ شِمَالَه بِيَمِيْنِه.

অর্থ: সুন্নাত হলো পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে “হাত বিছিয়ে রাখা ও বাঁধা” এ দু’টির উপরই একসঙ্গে আমল করা। কারণ, কিছু হাদীসে চেপে ধরার কথা এসেছে, আবার কিছু হাদীসে হাত হাতের উপর বিছিয়ে রাখার কথা এসেছে। আর কিছু হাদীসে বাহুর উপর হাত রাখার কথা এসেছে।

এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি হলো: ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা গোল বৃত্তের ন্যায় বানিয়ে কব্জি ধরবে এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম বাহুর উপর বিছিয়ে দিবে। তাহলে 'হাতের উপর হাত রাখা, বাহুর উপর হাত রাখা এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরা' সবগুলোই বাস্তবায়ন হবে। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লী:৩০০)

পাঠক-মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সবগুলো হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো হাদীসের অনুসরণ। এক হাদীসকে গ্রহণ করে অন্য হাদীসকে ত্যাগ করা, বা উপহাস করা এটা হাদীস মানা নয়। বরং সেটা হবে হাদীস মানার নামে তামাশা করা ও হাদীস অস্বীকার করা। গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা বুখারী শরীফের যে হাদীসটিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ডান হাতকে বিস্তৃত করে দেন, সেটাকে আমরা প্রথম দলীলরূপে গ্রহণ করেছি। ঐ হাদীসটি সম্পর্কে সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'ফাতহুল বারীতে' বলেছেন:-

قَوْلُهُ عَلَى ذِرَاعِهِ أَبْهَمَ مَوْضِعَهُ مِنَ الذِّرَاعِ وَفِي حَدِيثِ وَائِلٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى والرسغ والساعد وَصَحَّحَهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِدُونِ الزِّيَادَةِ وَالرُّسْغُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ هُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ وَسَيَأْتِي أَثَرُ عَلِيٍّ نَحْوُهُ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ. (رقم: 740)

অর্থাৎ, বাহুর কোন জায়গায় হাত রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট, আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত ওয়াইল রা. এর হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন। ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. ও অন্যান্যরা এটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারী শরীফে সালাত অধ্যায়ের শেষদিকে হযরত আলী রা. থেকে অনুরূপ 'আসার'-এর উল্লেখ সামনে আসছে। (৭৪০ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)

হাত বেঁধে নাভির উপর রাখা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ:

(১) হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন:

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:হা. ৩৯৫৯)

قَالَ الشَّيْخُ عَوَّامَةُ فِيْ تَحْقِيْقِ هٰذَا الْحَدِيْثِ: وَ هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، قَالَ الإِمَامُ الْقَاسِمُ ابْنُ قُطْلُوبْغَا فِيْ كِتَابِهِ "التَّعْرِيْف وَ الأَخْبَار بِتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الاِخْتِيَارِ" بَعْدَ مَا نَقَلَهُ سَنَدًا وَ مَتْنًا: وَ هٰذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدٌ عَابِدٌ السِّنْدِيُّ فِيْ طَوَالِعِ الأَنْوَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بَعْدَ تَخْرِيْجِ هٰذَا الْحَدِيْثِ: وَ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَ أَثْبَاتٌ. (مصنف ابن أبي شيبة: 320/3)

অর্থ: শাইখ আওয়ামা রহ. এই হাদীসের তাহকীকে বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. স্বীয় গ্রন্থ ‘আত্ তা’রীফ ওয়াল আখবার’ এ উক্ত হাদীসটিভ ‘সনদ ও মতন’ উল্লেখ করে বলেন, সনদটি মজবুত ও শক্তিশালী। আল্লামা আবেদ সিন্ধী রহ. ‘ত্বওয়ালিউল আনওয়ার’ নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি (সনদ ও মতনসহ) উল্লেখ করে বলেন ‘এই হাদীসের সনদের সকল রাবী গ্রহণযোগ্য, একজনও দুর্বল রাবী নেই’।

আল্লামা শাওকানী রহ. ‘নাইলুল আওতার’ গ্রন্থে প্রথমে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.-এর সংক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত **ثُمَّ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى** (ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন) উল্লেখ করার পর আহমাদ এবং আবূ দাউদের তাফসীলী রিওয়ায়াত

«ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَ الرُّسْغَ وَ السَّاعِدَ» (অতঃপর তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন) উল্লেখ করার পর এর ব্যাখ্যায় বলেন:

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ وَضَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّ يَدِهِ الْيُسْرَى وَرُسْغَهَا وَسَاعِدَهَا. وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ «وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ».

অর্থ: তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রেখেছেন। তাবারানীর বর্ণনায় বাক্যটি এরূপ: তিনি নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর কব্জির কাছে রেখেছেন। (নাইলুল আওতার:২/১৮৮)

(২) হযরত আলী রা. বলেন:

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلٰوةِ: إ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلٰوةِ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلٰوةِ وَضْعُ الأَكُفِّ، عَلَى الأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ. (أحمد:110/1، أبو داود: فى رواية ابن الأعرابى وابن داسة:756،ذكره الشيخ عوامة فى نسخته المحقق لأبى داود، و الدارقطنى:285/1، ابن أبى شيبة:3966 و فيه عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى ضعيف، لكن يشهد له الحديث السابق)

অর্থ: নামাযে সুন্নাত হলো: তালু তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। (মুসনাদে আহমাদ: ১১০,আবূ দাউদ: হা. নং ৭৫৬, দারাকুতনী: ১/২৮৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হা. নং ৩৯৬৬ এই সনদে আবূ শাইবা আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী রয়েছেন। যদিও তিনি দুর্বল, কিন্তু প্রথম হাদীসটি এর সমর্থন করছে, কাজেই ঐ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছে।)

(৩) হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন:-

«أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ». (أبو داود:758 وفيه أيضاً عبدالرحمن المذكور)

অর্থ: নামাযে হাতের তালু দিয়ে অপর তালু ধরে নাভির নীচে রাখবে। (আবূ দাউদ:হা. নং ৭৫৮। এতেও পূর্বোক্ত আব্দুর রহমান রয়েছেন যার দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে।)

(৪) হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসসান রহ. বলেন:-

سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يَضَعُ بَاطِنَ كَفٍّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ» (مصنف ابن أبى شيبة: 3963،وقال الماردينى فى الجوهر النقى:31/2 سنده جيد)

অর্থ: আমি আবূ মিজলায রহ.কে বলতে শুনেছি, অথবা হাজ্জাজ বলেন: আমি আবূ মিজলাযকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নামাযে কীভাবে হাত বাঁধবো? তিনি

প্রত্যুত্তরে বললেন: ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রেখে নাভির নীচে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হা. নং ৩৯৬৩, ইমাম মারদীনী রহ. স্বীয় কিতাব 'জাওহাররুন নাকী'তে এই আসার সম্পর্কে বলেন: এর সনদ জায়্যিদ-২/৩১)

(৫) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন:-

«يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» (مصنف ابن أبي شيبة : 3960)

অর্থ: নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬৯, এর সনদটি হাসান)

(৬) আল্লামা ইবনুল মুনযির রহ. তার 'আল-আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন:

وَقَالَ إِسْحَاقُ: تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ،وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ. (الأوسط : 243/3)

অর্থ: হযরত ইসহাক রহ. (যিনি ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ) তিনি বলেছেন: নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের নিকটতর। (আল-আওসাত:৩/২৪৩)

বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কিত দলীল ও এগুলোর পর্যালোচনাঃ

বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এক্ষেত্রে যে দলীলসমূহের আশ্রয় নেয়া হয়, সেগুলোর অবস্থা নিম্নরূপ:-

(১) হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস (সহীহ ইবনে খুযাইমা:১/২৭৩, হা. নং ৪৭৯) এটি সহীহ হাদীস নয়। এর সনদে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল আছেন। তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। মুয়াম্মালকে ইমাম বুখারী 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন এবং তিনি এ কথাও বলেছেন, 'আমি যাকে মুনকারুল হাদীস বলবো, তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে না'।

ইবনে সা'দ, আবূ যুর'আ রাযী, আবূ হাতেম রাযী ও দারাকুতনী প্রমূখ মুয়াম্মালকে 'অত্যধিক ভুলের শিকার' আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ.'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেছেন:

(مؤمل بن إسماعيل فى حديثه عن الثورى ضعيف) সুফিয়ান হতে মুয়াম্মালের বর্ণনায় দুর্বলতা আছে। (৫১৭২ নং হাদীসের অধীনে) এবং সুফিয়ান সাওরীর অন্য বর্ণনার বিপরীত। আর এই হাদীসে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈলেরই যে ভুল হয়েছে তা ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোর সনদে নজর বুলালেই প্রমাণ হয়। ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছে তার ছাত্র কুলাইব, তার থেকে আসেম, আর আসেম থেকে রিওয়ায়েত করেছে তার নয়জন ছাত্র, যথা:

১. বিশর ইবনে মুফাজ্জাল
২. যায়েদা
৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস
৪. আব্দুল ওয়াহেদ
৫. শু'বা
৬. যুহাইর ইবনে মু'আবিয়া
৭. সালাম ইবনে সুলাইম
৮. খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ
৯. সুফিয়ান সাওরী

আসেমের এই নয়জন ছাত্রের আটজনই (على الصدر) 'বুকের উপর' উল্লেখ করেননি। শুধু সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এই শব্দটি পাওয়া যায়। আর সুফিয়ান সাওরীর দুইজন ছাত্র এই হাদীসটি তার থেকে রিওয়ায়াত করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদ এবং মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল। এই দুইজনের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদও 'বুকের উপর' শব্দটি উল্লেখ করেননি। শুধু মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈলই 'বুকের উপর' শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর খোদ ইমাম সুফিয়ান সাওরীর আমলও এই হাদীস অনুযায়ী ছিল না। ইমাম নববী লিখেন, 'ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহুয়া ও আমাদের শাফেয়ীদের মধ্যে আবূ ইসহাক মারওয়াযী বলেন, উভয় হাত নাভির নিচে বাধবে।'

এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'বুকের উপর' শব্দটি মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল ভুলবশত বৃদ্ধি করেছেন। তাই এই হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। (শরহে মুসলিম:১/৭৩, আবূ দাউদ:১/১১২, মুসনাদে আহমাদ:৪/৩১৮, বাইহাকী:২/১৩১)

(২) ত্বাউস রহ. বলেন:

عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» (أبو دود- ৭৫৯)وعزاه المزي(-١٨٨ ٢٩) إلى أبي دود في المراسيل-

তাউসের বর্ণনাটি আবূ দাউদ শরীফের ৭৫৯ নং হাদীস । এটি 'মুরসাল' তথা সূত্র বিচ্ছিন্ন, আর মুরসালকে তারা প্রামাণ্য মনে করে না। তদুপরি এতে 'সুলাইমান ইবনে মূসা' নামের একজন রাবী আছেন। তার সম্পর্কে বুখারী রহ. বলেছেন: (**عنده مناكير**) তার কাছে অনেক মুনকার বিষয় আছে। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেছেন: (**ليس بالقوي**) তিনি মজবুত রাবী নন। (দ্রঃ আল- কাশিফ)

(৩) বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বাইহাকীতে আছে (বাইহাকী হা. নং ২১৩৩)। এর সনদে রওহ ইবনুল মুসায়্যাব আছেন। তিনি চরম দুর্বল রাবী। ইবনে হিব্বান রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। তার থেকে হাদীস নেওয়া জায়েয নেই। ইবনে আদী বলেছেন: (**أحاديثه غير محفوظة**) তার হাদীস সঠিক নয়। (তাহযীবুত তাহযীব:৪/২৩১)

(৪) হযরত আলী রা. এর হাদীসটি বুখারীর 'তারীখে কাবীরে' আছে। আবার এই হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী হাতেম 'আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা আছে 'বুকের উপর' (**على الصدر**) কথাটি নেই। তেমনিভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় এটি উল্লেখ আছে। সেখানেও 'বুকের উপর' কথাটি নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাঃ নং ৩৯৬২)

উপরন্তু, ইমাম বুখারী 'আত্ তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে উক্ত হাদীসটিকে সমর্থন করেননি। বরং সেটি উল্লেখ করার পর বলেছেন:

وَقَالَ قُتَيبة: عَنْ حُمَيد بْن عَبد الرَّحمَن، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي الجَعد، عَنْ عاصم الجَحدَرِيّ، عَنْ عُقبة مِن أصحابِ عليٍّ، عن عليٍّ، رضي الله عَنْهُ؛ وضعها على الكرسوع.

অর্থ: কুতাইবা রহ. হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে আবূল জা'দ থেকে, তিনি আসিম জাহদারীর সূত্রে হযরত আলী রা. এর ছাত্র উকবা

থেকে, তিনি হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি তার হাত কব্জির উপর রাখলেন। (আত্ তারীখুল কাবীর: জীবনী নং ৬৪৩৭)

এ কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাউছার-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: (**يُرْوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ وَلَا يَصِحُّ**) এ হাদীসটি সহীহ নয়।

(৫) হযরত হুলব রা. এর হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে ৫/২২৬, হা. নং ২২০২৮) আছে। সুফিয়ান থেকে শুধু ইয়াহইয়াই বুকের উপর হাত বাঁধার কথাটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমাদে ও দারাকুতনীতে ওয়াকী ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. দু'জন সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে সুফিয়ানের সঙ্গী আবূল আহওয়াস একই উস্তাদ সিমাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তাদের কারও বর্ণনাতেই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। সুতরাং এটি 'শায' (দুষ্প্রাপ্য) হাদীস, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা নিমাবী রহ. 'আসারুস সুনান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

وَ يَقَعُ فِيْ قَلْبِيْ: أَنَّ هٰذَا تَصْحِيْفٌ مِنَ الْكَاتِبِ، وَ الصَّحِيْحُ: يَضَعُ هٰذِهٖ عَلٰى هٰذِهٖ، فَيُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ: وَصَفَ يَحْيٰى الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَوْقَ الْمَفْصَلِ وَ يُوَافِقُهُ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ.

অর্থ: আমার মনে হয়, **على صدره** (বুকের উপর) কথাটি অনুলেখকের ভুলের কারণে হয়েছে। সঠিক হলো: এ হাতটি এ হাতের উপর রেখেছেন, এতে করে এটি পরের কথার সঙ্গেও এর মিল হয়। কারণ, পরে বলা হয়েছে: ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে দেখিয়েছেন। আর এটি তখন অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। (আসাররুস সুনান: ১০৮)

এ হিসেবে এই হাদীসটি হানাফীদের সমর্থন-সূচক দলীল হয়ে যায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, লা-মাযহাবীদের একটি দলীলও সহীহ নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নামাযে একাধিকবার রফয়ে ইয়াদাইন (হাত উঠানো) এর বিধান

একাধিক সহীহ হাদীস এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহীনের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এ কথা প্রমাণ করে যে, নামাযে শুধু প্রথম

তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা সুন্নাত। এছাড়া রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকা'আতে উঠার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয়। যেমনভাবে, সিজদায়ে সাহুর সময়, দুই সিজদার মাঝে এবং প্রত্যেক উঠা- নামার সময় হাত উঠানো সুন্নাত নয়। নিম্নে এই মাসআলার পক্ষে দলীল হিসেবে সহীহ হাদীস ও আসার উল্লেখ করা হলো:

১ম দলীল: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ • سورة: المؤمنون:1-2

ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন:

مخبتون متواضعون لاَ يلتفتون يَمِينا وَلاَ شمالاً وَلاَ يرفعون أَيْديهم فِي الصَّلاَةِ.

এখানে **خاشعون** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- অত্যন্ত একাগ্রতা ও বিনম্রভাবে দাঁড়ানো, ডানে-বামে না দেখা এবং রফয়ে ইয়াদাইন না করা, অর্থাৎ-বারবার হাত না তোলা। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস ১/২৮৪)

হযরত হাসান বসরী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

خاشِعُونَ الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى

এই আয়াতে **خاشعون** দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রথম তাকবীর ব্যতীত নামাযে আর হাত না উঠানো। (তাফসীরে সমরকন্দী-২/৪০৮)

২য় দলীল:

عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ».(أخرجه أبو داود-752. وابن أبي شيبة-2455.والطحاوى.عبدالرزاق فى المصنف-2530)

অর্থ: হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন, এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না। (আবূদাউদঃ হাদীস নং-৭৫২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হাদীস নং-২৪৫৫, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকঃ হাদীস নং-২৫৩০, দারাকুতনী-হাদীস নং-২২)

মুহাদ্দিস যফর আহমাদ উসমানী রহ.বলেন, হাদীসটি হাসান এবং এর দ্বারা দলীল দেয়া যায়। (ই'লাউস সুনান ৩/৮৬)

৩য় দলীল

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.(أخرجه أبو داود-748. الترمذى-257، وقال الترمذى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ.....الخ ورجاله رجال مسلم، كذا فى الجوهر النقى-37/1.وصححه ابن حزم فى المحلى-3/88)

অর্থ: হযরত আলক্বামা রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামাযের মতো নামায পড়বো না? একথা বলে তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে শুধু প্রথমবারই হাত তুলেছিলেন। (আবূ দাউদ হা. নং ৭৪৮, তিরমিযী হা. নং ২৫৭, নাসাঈ হা. নং ১০৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. নং ২৪৫৬, মুসনাদে আহমাদ হা. নং ৩৬৮০)

৪র্থ দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ". (أخرجه البيهقى وإسناده جيد. كذافى الجوهرالنقى. إعلاء السنن-3/68، 82)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রা. এর পিছনে নামায আদায় করেছি, তাদের কেউ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত উঠাতেন না। (বাইহাকী হা.নং ৮২১, ইলাউসসুনান-৩/৬৮)

وقال أحمد شاكر فى تعليقه: هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح، وما قالوا فى تعليقه ليس بعلة.

অর্থ: মুহাদ্দিস আহমাদ শাকির এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, ইবনে হাযম এবং অন্যান্য হাফিযুল হাদীস এ হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন। কেউ কেউ এর

বর্ণনাগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে শেষে বলেছেন, বস্তুত সেগুলো ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত নয়।

আল্লামা আলাউদ্দীন আততুরকুমানী রহ. বলেন, এ হাদীসের সকল রাবী সহীহ মুসলিমের রাবী। (আল জাওহারুন নাকী: ২/৭৮)

উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযী রহ. সুনান গ্রন্থে ইবনুল মুবারকের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা উপরিউক্ত বর্ণনা সম্পর্কে নয়। সেটি অন্য একটি হাদীস সম্পর্কে, যা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু প্রথমবার হাত উঠিয়েছেন।

এ হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে মুবারক রহ. আপত্তি করেছেন, পূর্বেরটির ব্যাপারে নয়। এই দুই বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য না জানার কারণে অনেক আলেম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন (দেখুন! নসবুর রায়াহ : ১/৩৪২)। এজন্য সুনানে তিরমিযীর বিভিন্ন নুসখায় দ্বিতীয় বর্ণনাটি ভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ইবনুল মুবারকের মন্তব্যও রয়েছে। অতএব তার মন্তব্য আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে নয়। (দেখুন! জামে তিরমিযী : ২/৪২,তাহকীক আহমাদ শাকির) এ বিষয়ে মুহাদ্দিস আহমাদ শাকিরের পর্যালোচনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেন, ‘রফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যঈফ হাদীসকে সহীহ, আর সহীহ হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পায়। তাদের অধিকাংশই নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়ে থাকে।’ (জামে তিরমিযী মুহাক্কাক : ২/৪২)

বর্তমান সময়ে আহলে হাদীস বন্ধুগণও তাদের সমশ্রেণীর পূর্বের লোকদের মতোই সহজ সরল জনগণকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ না করার বিষয়ে যেসব হাদীস এসেছে, সেগুলো যঈফ। তাদের এ কথায় যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়, সেজন্যই আমরা এ বিষয়ের হাদীসগুলোর সঙ্গে বড় বড় মুহাদ্দিসদের স্বীকৃতিও উল্লেখ করেছি।

৫ম দলীল:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» (رواه مسلم-430)

অর্থ: হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে (নামাযে ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতে দেখে) বললেন, ব্যাপার কী? তোমরা দেখছি অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মতো করে হাত উঠাচ্ছো! নামাযে স্থির থাকো! (সহীহ মুসলিম হা. নং ৪৩০)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। আর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু রফয়ে ইয়াদাইন স্থিরতা পরিপন্থী তাই আমাদের কর্তব্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশমতো স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়া।

উল্লেখ্য যে, হযরত জাবির রা. থেকেই সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় সালামের সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতে বা হাত উঠাতে নিষেধ করা হয়েছিলো। সেই হাদীসে **كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ** অর্থাৎ ‘অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায়’ কথাটি এসেছে। এখান থেকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, উভয় বর্ণনার বিষয়বস্তু এক। কাজেই সালামে হাতের ইশারা নিষেধ হলেও অন্য সময়ের রফয়ে ইয়াদাইন নিষেধ হয়নি।

কিন্তু তাদের এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। কারণ এ দু’টো সম্পূর্ণ ভিন্ন হাদীস এবং দুই হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে।

বর্ণনা দু’টির মধ্যে ৪টি পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) এ হাদীস থেকে বুঝা যায় সাহাবীগণ একা একা নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাদেরকে বারবার হাত উঠাতে দেখে ঐ কথা বলেছিলেন। পক্ষান্তরে, অপর হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

সঙ্গে জামা'আতে নামায পড়ছিলেন এবং সালাম ফিরানোর সময় তারা হাত দিয়ে ইশারা করেছিলেন।

(খ) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নামাযের মধ্যে হাত উঠানোর কারণে। পক্ষান্তরে, অপর হাদীসটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন হাত উঠানোর কারণে নয়, বরং সালামের সময় ডানে-বামে হাত দ্বারা ইশারা করার কারণে।

(গ) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার হাত না উঠিয়ে শান্ত ও স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অপর হাদীসটিতে সালাম ফিরানোর পদ্ধতি শিখিয়েছেন। (দ্র.নাসবুর রায়াহ্)

(ঘ) সালামের সময় হাত উঠানো ব্যক্তিকে একথা বলা যায় না যে, 'তুমি নামাযে স্থির থাকো'। কেননা সালামের দ্বারা তো নামায আদায়কারী ব্যক্তি নামায থেকে বের হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় বর্ণনায় যেখানে সালামের সময় হাত উঠানোর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাতে **اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ** বাক্যটি নেই।

দুই বর্ণনার মধ্যে এতোগুলো পার্থক্য থাকা অবস্থায় কীভাবে বলা যায় যে, দুই হাদীসের বিষয়বস্তু এক? এটা কীভাবে সম্ভব যে, হযরত জাবির রা.-এর মতো বিজ্ঞ সাহাবী একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে, ভিন্ন মাসে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটসহ বর্ণনা করবেন?

সাহাবায়ে কিরাম রা. হাদীস বর্ণনার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী বর্ণনা করতেন কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া। তাই এটা পরিষ্কার যে, এ দু'টি হাদীস সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তুও ভিন্ন। সুতরাং সালামে যেমন হাতের ইশারা নিষেধ, তেমনিভাবে রুকূর সময়ও হাত উঠানো অন্যান্য হাদীস দ্বারা নিষেধ। উভয় হাদীসকে 'সালামের সময় হাত উঠানো নিষেধ'-এ মর্মে পেশ করা যাবে না, যা আহলে হাদীস বন্ধুগণ করে থাকেন।

৬ষ্ঠ দলীল:

عن ابن عمر قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ». (أخرجه الحميدى فى مسنده من طريق سفيان قال ثناالزهرى قال أخبرنى سالم بن عبد الله عن أبيه, وسنده صحيح 277/2 برقم : 614)

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ করতে চাইতেন এবং রুকূ থেকে উঠতেন তখন হাত উঠাতেন না, দুই সিজদার মাঝেও না।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ হুমাইদী রহ. তার মুসনাদে এ হাদীস এনেছেন এবং এর সনদ সহীহ। (মুসনাদে হুমাইদী হা. নং ৬১৪)

৭ম দলীল:

عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ. رواه البيهقى فى الخلافيات، قال الحافظ مغلطائى: لابأس بسنده وقال الشيخ عابد السندى: هذاالحديث عندى صحيح لا محالة رجاله رجال الصحيح، راجع (الإمام ابن ماجة وكتابه السنن ص252 قلت: ويؤيده أيضاً عمل ابن عمر على وفقه كما عند الطحاوى110/1 وابن أبى شيبة-2467،والبيهقى فى المعرفة.....

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন একবার ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন, এরপর আর করতেন না। (বাইহাকী, আল খিলাফিয়াত)

হাফিয মুগলতাঈ রহ. বলেছেন, এ হাদীসটির সনদে কোনো সমস্যা নেই। (শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ মুগলতাঈ: ৫/১৪৯৬) শাইখ আবিদ সিন্ধী রহ. বলেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে এটি অবশ্যই সহীহ হাদীস।

৮ম দলীল:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ، (أخرجه البيهقى فى الخلافيات كما فى نصب الراية-1/404)

অর্থ: আব্বাদ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন শুধু নামাযের শুরুতেই উভয় হাত তুলতেন, এরপর নামায শেষ করা পর্যন্ত আর কোথাও হাত তুলতেন না। (নাসবুর রায়াহ: ১/৪০৪)

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

৯ম দলীল:

খুলাফায়ে রাশেদীনও রফয়ে ইয়াদাইন করেননি। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা নিমাভী রহ. খুলাফায়ে রাশেদীন-এর কর্মধারা বিষয়ক বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

وَ أَمَّا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ رَفْعُ الْأَيْدِىْ فِيْ غَيْرِ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ. (آثارالسنن ص140)

খুলাফায়ে রাশেদীন শুধু প্রথম তাকবীরের সময় ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন, অন্যসময়ে ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর বিপক্ষে যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। সুতরাং সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

খুলাফায়ে রাশেদীন রা. -এর পর আইম্মায়ে কিরামগণ মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যিকারের অনুসারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সুন্নাহকেও নিজের সুন্নাহর মতো অনুসরণীয় ঘোষণা করেছেন। কেননা তাদের সুন্নাহ ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকেই গৃহীত। তাই তারা যখন নামাযের সূচনা ছাড়া অন্যকোনো স্থানে হাত

উঠাতেন না, তখন একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের কাছেও নামাযের সূচনা ছাড়া অন্যকোনো স্থানে 'রফয়ে ইয়াদাইন' না করাই গ্রহণযোগ্য। বস্তুত এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ।

আহলুল হাদীস ভাইদের দলীল ও সেগুলোর পর্যালোচনা

আহলুল হাদীস বন্ধুগণ যেসব হাদীস পেশ করেন, সেগুলো দু'ধরনের। কিছু আছে প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম থেকে এবং কিছু আছে নওমুসলিম সাহাবা থেকে। সুতরাং দু'প্রকার হাদীসের দু'ধরনের জওয়াব।

(ক) প্রবীণ সাহাবীদের রিওয়ায়াত: যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীস:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، (متفق عليه)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূতে যাওয়ার সময় এবং উঠার সময় হাত তুলতেন। (বুখারী হা. নং ৭৩৫ ও মুসলিম হা. নং ৩৯০)

এ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর মৌখিক বর্ণনা এবং বাস্তবে তার আ'মলী রিওয়ায়াত দেখুন, তাহলে এ হাদীসের জওয়াব সহজেই বুঝে আসবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বিশিষ্ট তিনজন শাগরিদ হযরত মুজাহিদ, আব্দুল আজিজ ও আবূল আলিয়া রহ. সকলেই তার আমল শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর রা.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ মুজাহিদ রহ. বলেন:

«مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ». (مصنف ابن أبي شيبة-417/2)

অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে শুধুমাত্র নামাযের সূচনা ছাড়া অন্যকোনো সময় হাত তুলতে দেখিনি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/৪১৭, হা. নং ২৪৫২, ২৪৬৭; জাওহারুন নাকী কিতাবে এ সনদটিকে সহীহ বলা হয়েছে: ৩/৭৩, আব্দুল আজিজ-এর বর্ণনার জন্য দেখুন, মুআত্তা হা. নং ১০৮)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَرْفَعُ أَيْدِيْنَا فِيْ بَدْءِ الصَّلَاةِ وَ فِيْ دَاخِلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِيْ دَاخِلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَ ثَبَّتَ عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ بَدْءِ الصَّلَاةِ. (أخبار الفقهاء و المحدثين-378)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কায় থাকাকালীন নামাযের শুরুতে এবং নামাযের ভিতরে রুকূর সময় হাত উঠাতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা চলে আসলেন, তখন নামাযের মধ্যে রুকূর সময় হাত উঠানো বন্ধ করে দিলেন। শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উঠানো অব্যাহত রাখলেন। (আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন লিল কাইরুনী: পৃ. ২১৪, হা. নং ৩৭৮)

যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীস দ্বারা ‘আহলে হাদীস’ বন্ধুগণ দলীল দিচ্ছেন, তার শাগরিদগণ তার বছরের পর বছরের আমল বর্ণনা করছেন যে, তিনি নামাযের শুরুতে ছাড়া নামাযের মধ্যে কোথাও হাত তুলতেন না। কোনো সাহাবী নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করার পর কি নিজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন? কখনোই না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, নামাযের ভিতরে হাত তোলার বিধানটি মূলত মদীনা আসার পর রহিত হয়ে গিয়েছিলো, যেমনটি তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.) মৌখিক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আহলে হাদীস বন্ধুগণ যে হাদীসটি পেশ করে থাকেন যদিও তার সনদ বুখারী ও মুসলিমের, কিন্তু সেটি মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর মক্কী যমানার হাদীস, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর রহিত হয়ে গেছে। যে কারণে পরবর্তী সময়ে তিনি একবার মাত্র হাত তুলতেন। কোনো হাদীসের সনদ সহীহ হলেই সেটা আমলযোগ্য প্রমাণিত হয় না। হ্যাঁ, যদি তার হুকুম রহিত না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমলযোগ্য হয়।

তাছাড়া, আহলে হাদীস বন্ধুরা যেভাবে রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন (তথা রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠার পর ও সিজদা থেকে উঠে), এই রফয়ে ইয়াদাইন ইবনে উমর রা.-এর এ হাদীস থেকে সাবেত হয় না। কেননা হযরত ইবনে উমর রা.-এর হাদীসে শুধু রুকূতে যাওয়া ও রুকূ থেকে উঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ আছে। সিজদা থেকে উঠে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীস তাদের আমলের পক্ষে দলীল হয় না। এ সহজ সরল কথাটি না বুঝতে পারায় 'আহলে হাদীস' বন্ধুগণ ধোঁকায় পড়েছেন।

(খ) আহলে হাদীস বন্ধুদের দ্বিতীয় দলীল কতিপয় নওমুসলিম সাহাবীদের রিওয়ায়াত:

যথা- **১.** মালিক ইবনে হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত:

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوْعِهِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُوْدِهِ. (المحلى)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় হাত তুলতেন। (মুহাল্লা: ৩/৮)

২. ওয়াইল ইবনে হুজর রা.-এর রিওয়ায়াত:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمالَه بِيَمِيْنِهٖ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِهٖ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه.

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নামাযের ভিতরে রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠার পর ও সিজদায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত তুলতেন। (মুহাল্লা: ৩/৮)

এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো, শুধু নওমুসলিম সাহাবীগণ হাত উঠানোর হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, প্রবীণ সাহাবীগণ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজ-কর্ম অনুসরণ করার জন্য ব্যাকুল থাকতেন, বিশেষ করে চার খলীফা রা.-এর কেউই নামাযের ভিতরে হাত উঠানোর হাদীস বর্ণনা করেননি বা নিজেরা আমল করেননি। যেমন, চার খলীফার আমল দেখুন:

وَ أَمَّا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ رَفْعُ الْأَيْدِىْ فِيْ غَيْرِ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ.

এখানে স্পষ্ট হলো যে, চার খলীফার কেউ নামাযের ভিতরে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত তুলতেন না। (আসারুস সুনান: ১৪৪) আর যেসব আসারে তাদের থেকে ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করার কথা পাওয়া যায়, সেগুলো সহীহ নয়।

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পুরোনো সাহাবা যাদের তাওহীদের বিশ্বাস মজবুত হয়ে গিয়েছিলো, তাদের জন্য নামাযের ভিতর হাত উঠানো নিষেধ হয়ে গেলেও যারা নতুন সাহাবা তাদের জন্য নামাযের ভিতরে হাত উঠানো নিষেধ হয়নি। কারণ একদিকে তারা নতুন মুসলমান হওয়ার কারণে বারবার শিরকের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা আসতো, কেননা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা অনেক দেব-দেবীর পূজা করতেন। অপরদিকে, হাত উঠানোর অর্থ হচ্ছে, “আল্লাহ ব্যতীত যতো বাতিল মাবুদ আছে সবই পিছনে ফেলে বাতিল করে দেয়া।” এ কারণেই যখন কোনো নওমুসলিম তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে দীন শিখতে আসতেন তখন তাদের শিরকের ওয়াসওয়াসা দূর করা শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের ভিতরে রুকূতে ও সিজদায় হাত উঠিয়ে দেখাতেন, যাতে প্রয়োজনে তারা এ পন্থায় শিরকের কুমন্ত্রণা দূর করতে পারেন। এটা শুধু তাদের সাথে সীমিত ছিলো। এজন্য এটা দেখা সত্ত্বেও কোনো প্রবীণ সাহাবী নামাযের মধ্যে হাত উঠাতেন না, বা অন্যদের শেখাতেন না। কারণ তারা বুঝতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা নতুন মুসলমানদের শিক্ষা দেয়ার জন্য করেছেন, যা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।

সারকথা হলো, নামাযের মধ্যে রুকূ-সিজদায় হাত উঠানো নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও নওমুসলিমদের তাওহীদ মজবুত হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য সাময়িকভাবে এর

অনুমতি ছিলো। কাজেই এখনো যদি কোনো নওমুসলিম এটা করতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করা হবে না, তবে পুরনো মুসলমানদেরকে এটা নিষেধ করা হবে। কারণ এটা তাদের জন্য আর প্রয়োজন নেই। এই সূক্ষ্ম কথাটি আহলে হাদীস বন্ধুগণ না বুঝতে পারায় 'উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর ন্যায় নওমুসলিমদের আমল সব মুসলমানদের কাঁধে চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক দীনী বুঝ দান করুন। আমীন।

তাছাড়া, মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা.-এর হাদীসও তাদের দলীল হয় না। কেননা সেখানে সিজদা করার সময়ও রফয়ে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ আছে। অথচ তারা সিজদা করার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করেন না।

আহলে হাদীস বন্ধুগণ সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার জন্য দাবি করে থাকেন যে, বারবার হাত উঠানোর হাদীস চার খলীফাসহ ২৫ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে এবং তাদের হিসাব মতে বারবার হাত উঠানোর হাদীসের রাবীর সংখ্যা নাকি পঞ্চাশজন এবং এ ব্যাপারে যতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো একত্র করলে তার সংখ্যা হবে চারশত। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। নিম্নে **তাদের এ ভিত্তিহীন দাবীর অসারতা তুলে ধরা হলো:**

(ক) তারা চার খলীফা সম্পর্কে দাবী করেন যে, তারা সকলেই নামাযের মধ্যে বারবার হাত উঠাতেন। অথচ একটু পূর্বেই আমরা দলীলসহ প্রমাণ করে এসেছি যে, চার খলীফার কেউই 'রফয়ে ইয়াদাইন' করতেন না। কাজেই তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) তারা ৫০ জন রাবী বা সাহাবীর ব্যাপারে দাবী করেছেন যে, 'তারা সবাই বারবার হাত উঠাতেন'। তাদের এ দাবীও সম্পূর্ণ ভুল। মদীনাবাসী কোনো সাহাবীই বারবার হাত উঠাতেন না। আর কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদসহ ১৫০০ সাহাবা বসবাস করতেন, তাদের কেউ রুকূ-সিজদার সময় হাত উঠাতেন না। তাহলে তাদের এই ৫০ জন সাহাবী কারা ছিলো?

আহলে হাদীসের ইমাম শাওকানী রহ. লিখেছেন যে, আল্লামা ইরাকী রহ. রুকূ-সিজদা করার মতো নামাযের শুরুতে হাত উঠানোর বর্ণনাকারী সাহাবার সংখ্যা গণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা হলো ৫০জন। এদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবাও রয়েছেন। এই একই কথা সানআনী রহ. "সুবুলুস সালাম: শরহু বুলূগিল মারাম" (১/২৭৪) গ্রন্থেও বলেছেন।

এর দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুদের ধোকা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ৫০জন সাহাবা যে হাত উঠানোর বর্ণনা করেছেন, তা শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে। নামাযের ভিতরে রুকূ-সিজদার সময় হাত উঠানোর বর্ণনা তারা করেননি। খোদ আহলে হাদীসের এক ইমামের বর্ণনা থেকেই তা উঠে এসেছে। এরপরেও কোন মুখে তারা এ দাবী করেন যে, ৫০জন সাহাবী থেকে রুকূ ও সিজদার সময় হাত উঠানোর প্রমাণ আছে? এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও প্রতারণামূলক একটি দাবী মাত্র।

(গ) তাদের তৃতীয় দাবী রফয়ে ইয়াদাইন-সংক্রান্ত মোট হাদীসের সংখ্যা ৪০০। আমাদের প্রশ্ন: তাহলে ১৪০০ বছরের মধ্যে তারা এ ৪০০ হাদীস একত্র করে হাদীসের একটা সংকলন বের করলেন না কেনো? তাদেরকে আরো সময় দেয়া হলো, তারা উক্ত হাদীসগুলোর সংকলন দ্বারা একটি কিতাব তৈরী করে উম্মতের সামনে পেশ করুক, যাতে উম্মত দেখতে পায় আদৌ ৪০০ হাদীস আছে কী-না? বা থাকলে সেগুলোর হালত কী? আর যে দু-চারটি হাদীস তারা পেশ করবে তা কতোটুকু গ্রহণযোগ্য তাও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আহলে হাদীস বন্ধুদের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমাদ শাকির রহ. লিখেছেন, 'রফয়ে ইয়াদাইনের বিষয়ে এক শ্রেণীর লোক যঈফ হাদীসকে সহীহ এবং সহীহ হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পায়। তাদের অধিকাংশ লোকেরা নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়ে থাকেন।' (জামে তিরমিযী: ২/৪২)

ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান

কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, জামা'আতের নামাযে ইমাম আস্তে ক্বিরা'আত পড়ুক, বা জোরে ক্বিরা'আত পড়ুক মুকতাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না। যেমনভাবে মুকতাদী সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যকোনো সূরা বা আয়াত পড়ে না। নিম্নে এই মাসআলার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত ও সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১ম দলীল: মুকতাদীর সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্যকোনো সূরা না পড়ার সমর্থনে সবচেয়ে উত্তম ও উজ্জ্বল দলীল হলো কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ: 'যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।' (আল-আ'রাফ: ২০৪)

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, এ আয়াত ইমামের পিছনে ক্বিরা'আত পড়া নিষেধ হওয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২৮১, আল-মুগনী: ১/৪৯০, আহকামুল কুরআন: ৩/৩৯)

অতএব, এ আয়াতের হুকুম অনুযায়ী ইমাম জোরে ক্বিরা'আত পড়লে মুকতাদী চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আর ইমাম আস্তে ক্বিরা'আত পড়লে মুকতাদী একেবারে নিশ্চুপ থাকবে। মুকতাদী সূরা-ক্বিরা'আত কিছুই পড়বে না। এ আয়াতের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাই, যদিও আর কোনো দলীল উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না, তথাপি বিষয়টির সমর্থনে কয়েকটি দলীল পেশ করা হচ্ছে।

২য় দলীল: আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন: **فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** 'যখন আমি কুরআন পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করবেন' (আল-ক্বিয়ামাহ: ১৮)

এ আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত জিবরীল আ.-এর তিলাওয়াতের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুম কীভাবে পালন করেছেন? চুপ থেকে

না জিবরীল আ.-এর সাথে সাথে পড়ে? তিনি যা করেছেন মুকতাদীরও তা-ই করণীয়। ইমাম বুখারী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আপনি এই কুরআন মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং চুপ থাকুন' (সহীহ বুখারী হা. নং ৫)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকা ও মনোযোগ দিয়ে শোনার এতো গুরুত্ব ও আদেশ, তাহলে নামাযের ভিতরে এর গুরুত্ব ও আদেশ আরো বেশি, তা সহজেই অনুমেয়।

৩য় দলীল:

عن ابى موسى قال إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا. فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا... الصحيح لمسلم:404

অর্থ: হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নসীহত করলেন এবং সুন্নাহ তথা দীনের পথ বাতলে দিলেন। আর বললেন, 'যখন তোমরা নামায পড়তে শুরু করো তখন প্রথমে কাতার সোজা করো। এরপর একজন তোমাদের ইমাম হবে। সে যখন তাকবীর দেয় তখন তোমরাও তাকবীর দিবে এবং সে যখন ক্বিরা'আত পড়ে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে ...। (সহীহ মুসলিম হা.নং ৪০৪) উল্লেখ্য, সহীহ মুসলিমের এ হাদীসে স্পষ্টভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামের পিছনে ক্বিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন।

৪র্থ দলীল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا... سنن ابن ماجة:846

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'জামা'আতের নামাযে ইমাম হলো অনুসরণের জন্য। অতএব, ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। আর

ইমাম যখন ক্বিরা‘আত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ হা.নং ৮৪৬)

ইমাম মুসলিম রহ.-কে এ হাদীসের মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার মতে হাদীসটি সহীহ’ (সহীহ মুসলিম হা.নং ৪০৪) । তাছাড়া, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে হাযম রহ.ও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ, মুগলতাঈ: ৫/১৪৫২)

৫ম দলীল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ... صحيح البخارى:6402

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা ফিরিশতাগণও তখন আমীন বলে থাকেন।’ (সহীহ বুখারী হা.নং ৭৮১)

লক্ষণীয় যে, এ হাদীসে শুধু ইমামকে কুরআন পাঠকারী বলা হয়েছে, মুকতাদীকে কুরআন পাঠকারী বলা হয়নি। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মুকতাদীগণ ইমামের পিছনে কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না।

৬ষ্ঠ দলীল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقَالَ: مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " الصحيح لمسلم:410

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) বলে غير المغضوب عليهم ولا الضالين এবং মুকতাদী বলে ‘আমীন’, তখন যার আমীন আসমানবাসীর

আমীনের সাথে মিলে যায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।' (সহীহ মুসলিম হা.নং ৪১০)

উপরিউক্ত দুই হাদীসে জামা'আতের নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান নির্দেশিত হয়েছে। **লক্ষণীয় বিষয় হলো:** উভয় হাদীসে শুধু ইমামকে কুরআন পাঠকারী বলা হয়েছে এবং মুকতাদীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে সূরা ফাতিহা শেষ করবে তখন তারাও ইমামের 'আমীনের' সাথে 'আমীন' বলবে। তাদেরকে সূরা ফাতিহা পড়ে তারপর 'আমীন' বলতে বলা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু ইমামই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, আর মুকতাদীরা চুপ থাকবে। ইমামের সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে এবং তা শুনতে পেলে তখন মুকতাদীরা আস্তে আমীন বলবে।

৭ম দলীল:

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ إتحاف الخيرة مع المطالب العالية:1567 , المؤطا لمحمد:117

অর্থ: হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের ক্বিরা'আতই যথেষ্ঠ হবে'। (ইতহাফুল খিয়ারাহ হা. নং ১৫৬৭, মুআত্তা মুহাম্মাদ হা.নং ১১৭। আল্লামা বদররুদ্দীন 'আইনী, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম এবং আল্লামা বূসিরী রহ.-এর মতো প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমামগণ এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন 'মুখতাসারু ইতহাফুস সাদাহ' হা. নং ১৪৪০, 'আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ' হা. নং ১১৭)

এছাড়াও ইমামের পিছনে মুকতাদীর ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে আরো অনেক সহীহ হাদীস ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর ফাতাওয়া রয়েছে। বেশি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় এখানে শুধু দুটি আয়াত ও কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইমামের পিছনে জামা'আতের নামাযে মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে না। আর ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা না পড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম এবং

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে উম্মতের অভিমত ও আমল। তারপরও আমাদের কিছু দীনী ভাই যারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন তারা এ বিধানকে সহীহ হাদীসের খেলাফ মনে করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে একথা বলে বিভ্রান্ত করছেন যে, যারা ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ে না তাদের নামায হয় না। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সহীহ দীনী বুঝ দান করুন। আমীন।

নিম্নে এ বিষয়ে তথাকথিত আহলে হাদীস ভাইদের পেশকৃত দলীলের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হলো:

১ম দলীল:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي «لأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ» ، قُلْنَا: إِى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِهَا»(وفى رواية البخارى: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.)الجامع للترمذى:311, الصحيح للبخارى:756

অর্থ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন, 'একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন, এ সময় তার ক্বিরা'আতে খটকা লাগলো। তিনি নামায শেষে বললেন, তোমরা বোধ হয় আমার পিছনে ক্বিরা'আত পড়েছিলে? সাহাবীগণ বললেন, জী-হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া এমন কাজ করো না। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না।' (সুনানে তিরমিযী হা.নং ৩১১)

আহলুল হাদীস ভাইদের উপস্থাপিত দলীলগুলোর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এ হাদীসের প্রকৃত অবস্থা থেকে অন্যগুলোর অবস্থাও অনুমান করা যাবে। তাই আসুন, এ হাদীস সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ইমামদের মন্তব্য জেনে নেই:

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, হাদীস বিশারদ ইমামগণের দৃষ্টিতে এ হাদীস অনেক কারণেই যঈফ। ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এ

হাদীসকে যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। (মাজমূআতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া: ২৩/২৮৬)

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নিমাভী রহ. বলেন, হযরত উবাদা রা.-এর সূত্রে ক্বিরা'আত পাঠের অসুবিধার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তার সব কটি সনদই যঈফ। (আসারুস সুনান পৃ. ১০১)

৩. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মা'আরেফুস সুনানে' এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। যার সারকথা এই যে, এ হাদীসের সনদে আট ধরণের এবং মতনে তেরো ধরণের ইযতিরাব বা সমস্যা রয়েছে। তাই এ হাদীসটি যঈফ (বা অগ্রহণযোগ্য) সাব্যস্ত হয়। (মা'আরিফুস সুনান: ৩/২০২)

৪. আহলুল হাদীস ভাইদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব মরহুম নাসিরুদ্দীন আলবানী এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, এ হাদীসের বিধান রহিত হয়ে গেছে। (সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি পৃ.৯৩)

মোটকথা, এ ধরণের সন্দেহযুক্ত হাদীসকে অবলম্বন করে কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের বিপরীত হুকুম দেয়া যায় না এবং কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ত্যাগ করা যায় না।

২য় দলীল: হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।' (সহীহ বুখারী হা.নং ৭৫৬)

পর্যালোচনা:

(ক) এ হাদীসটি সহীহ, কিন্তু এর বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। কারণ 'ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না'-এ বিধান ইমাম, একাকী নামায আদায়কারী, মুকতাদী, নাকি ইমাম-মুকতাদী সবার জন্য প্রযোজ্য, তা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তাই সুস্থ-জ্ঞানের দাবি হলো এ হাদীসের ব্যাখ্যা বা মর্ম সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং হাদীস বিশারদ ইমামদের থেকে জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। সাহাবায়ে

কিরামের মধ্য থেকে হযরত জাবির রা. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীসের হুকুম একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। আর ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ., ইমাম আবূ দাঊদ রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. প্রমুখ ইমামগণ হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, ফাতিহা ছাড়া নামায না হওয়ার হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। মুকতাদীর জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। আমরা হানাফীরা সাহাবা এবং মুহাদ্দিস ইমামদের থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসের এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করি। তাহলে আমাদের আমলকে কীভাবে হাদীস পরিপন্থী, বা ভুল বলা যেতে পারে? (জামে তিরমিযী হা.নং ৩১২, সুনানে আবূ দাঊদ হা.নং ৮২২)

(খ) এ হাদীসের অনেকগুলো সনদে **فصاعدا, فمازاد** ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। সে হিসেবে হাদীসের অর্থ হয়, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পড়ে না তার নামায হয় না।' এ বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য, মুকতাদীর জন্য নয়। (সহীহ মুসলিম হা. নং ৩৯৪) অথচ আহলুল হাদীস ভাইয়েরা বলেন, মুকতাদী শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, ফাতিহা ছাড়া অন্যকিছু পড়বে না। হাদীসটি যদি জামা'আতে নামায আদায়কারী মুকতাদী সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে পূর্ণ হাদীসটির উপরই আমল করে ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়াও আরো একটি সূরা বা কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা উচিত এবং হাদীস বর্ণনার সময় বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করা উচিত। অথচ তারা পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন না এবং মুকতাদীকে সূরা মিলানোর নির্দেশও দেন না। (সহীহ মুসলিম : ৩৯৪)

(গ) সাহাবা কিরাম ও মুহাদ্দিস ইমামগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ হাদীসের বিধান ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর সাথে খাস না করে যদি মুকতাদীকেও ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়তে বলা হয়, তাহলে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও অনেক সহীহ হাদীসের সাথে এ হাদীসের স্পষ্ট সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আর সংঘর্ষ দূর করার জন্য অনেক অজুহাতের অবতারণা করতে হয়, কিন্তু

তারপরও সংঘর্ষ দূর হয় না। শেষ ফলাফল এই হয় যে, একটি হাদীসের শাব্দিক অর্থ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কুরআনের একাধিক আয়াত ও অনেকগুলো স্পষ্ট সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করতে হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা একাকী নামায পড়া অবস্থায় এ হাদীসের উপর আমল করছে। আর ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় কুরআনের একাধিক আয়াত ও একাধিক সহীহ হাদীসের উপর আমল করছে। তারপরও তাদের আমলকে হাদীস-বিরোধী বলে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। সকলেই জানি, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু সে সর্বদাই পথভ্রষ্ঠ করার জন্য আমাদের পিছনে বিরামহীন শ্রম দেয়। সুতরাং সাবধান! হে মুসলিমগণ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' আস্তে বলা সুন্নাত

হানাফী মাযহাব অনুসারে, নামাযে ইমাম-মুক্তাদি-মুনফারিদ সকলের জন্যই সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত, এবং সকলের জন্যই 'আমীন' আস্তে বলা আরেকটি সুন্নাত। যেহেতু নামাযে 'আমীন' বলা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো মতবিরোধ নেই, তাই এটাকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং 'আমীন' আস্তে বলা সুন্নাত হওয়ার বিষয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে, সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' হলো একটি দু'আ। এটি সকলের নিকট স্বীকৃত এবং এ বিষয়ে কোনো মতভিন্নতা নেই। আর দু'আ আস্তে করা যে মুস্তাহাব, এর সমর্থনে আমরা কিছু প্রমাণ পেশ করছি:

(1) قال الله في القران المجيد: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا....الخ الآية سورة يونس (89 :

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা (হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ.-এর দু'আর জওয়াবে) বললেন, তোমাদের দু'আ কবূল হলো। সুতরাং তোমরা দৃঢ়পদ থাকো। (সূরা ইউনুস:৮৯)

(2) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِذا دَعَا أَمن هرون على دُعَائِهِ يَقُول: آمين.... فذلك قوله: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا. (الدر المنثور:4/347)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, যখন হযরত মূসা আ. দু'আ করতেন তখন হযরত হারুন আ. তার দু'আর উপর 'আমীন' বলতেন। **قد أجيبت دعوتكما** দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। (দুররে মানসূর : ৪/৩৪৭)

(3) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي التَّأْمِينَ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّينَ قَبْلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَعْطَى هَارُونَ، يَدْعُو مُوسَى وَيُؤَمِّنُ هَارُونُ (صحيح ابن خزيمة:1586)

অর্থ: হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা (দু'আর স্থলে) 'আমীন' (এর নি'আমাত) একমাত্র আমাকেই দিয়েছেন। আমার পূর্বে আর কোনো নবী আ.কে দেননি, তবে শুধু হারুন আ.কে দিয়েছিলেন। হযরত মূসা আ. দু'আ করতেন আর হযরত হারুন আ. শুধু 'আমীন' বলতেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ হা. নং ১৫৮৬)

(4) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থ: তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে তোমাদের প্রতিপালক-এর নিকট দু'আ করো, নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ: ৫৫)

(5) وقال: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

অর্থ: তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো (দু'আ ও যিকির করো) সকালে ও সন্ধ্যায়, মনে মনে, বিনয় ও ভীতির সাথে, এবং মুখে অনুচ্চস্বরে। যারা গাফিলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আ'রাফ: ২০৫)

(6) وقال: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

অর্থ: এটা সেই রহমতের বর্ণনা, যা তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকেছিলো চুপিসারে। (সূরা মারইয়াম: ২-৩)

(7) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: رَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ(تفسير ابن كثير:2/221)

অর্থ: হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম রা. জোরে জোরে দু'আ করছিলেন; তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে লোক-সকল! আস্তে (দু'আ করো), তোমরাতো এমন কাউকে ডাকছো না, যিনি শোনেন না অথবা তোমাদের থেকে দূরে। তোমরা যাকে ডাকছো তিনি তোমাদের অতি-নিকটে এবং সব কথা শোনেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির: ২/২২১)

উল্লেখ্য যে, ১নং আয়াত এবং ২ ও ৩নং হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'আমীন' একটি দু'আ। আর ৪, ৫ ও ৬ নং আয়াত এবং ৭নং হাদীস দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আল্লাহ তা'আলা দু'আ করতে শিখিয়েছেন বিনীতভাবে, চুপিসারে, মনে মনে, ভীতির সাথে ও অনুচ্চস্বরে।

অতএব, সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলার ক্ষেত্রে ঠিক এ শিক্ষাটিই মানতে হবে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এমন শিক্ষাই দিয়েছেন।

নামাযে সূরা ফাতিহা শেষে 'আস্তে আমীন' বলার পক্ষে হাদীস শরীফ থেকে আরও কিছু স্পষ্ট দলীল পেশ করা হচ্ছে।

(1) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَه وفي رواية: وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (رواه الترمذى:ح248, وأحمد:4/316, وحاكم في المستدرك:ح2913 قال الذهبي: على شرط البخارى ومسلم.)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি যখন ﴿غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين﴾ পড়লেন, তখন 'আমীন' বললেন এবং 'আমীন' বলার সময় তার আওয়াজকে নিচু করলেন। (তিরমিযী হা.নং ২৪৮, মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩১৬, মুসতাদরাকে হাকেম হা.নং ২৯১৩)

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ﴿غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين﴾ বলে, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা যে ব্যক্তির 'আমীন' বলা ফিরিশতাদের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী হা.নং ৭৮২, মুসলিম হা.নং ৪১০) আর একথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ফিরিশতারা আমীন আস্তে বলে। কারণ, তাদের আমীন কেউ শুনতে পায় না। তাই এ হাদীসের উপর শতভাগ আমল করতে চাইলে অনুচ্চস্বরে বা আস্তে আমীন বলতে হবে।

وفي رواية عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم إِذَّا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم وَلاَ الضآلين} ، فقولوا: آمِين، فإنّ المَلَائِكَةَ تقول: آمين، فمن وافق تَأْمِينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ

(رواه احمد:2/270, وابن حبان:1804, والدارمي:1246, والنسائي:927)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ বলবে, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলবে। ফিরিশতারাও তখন ‘আমীন’ বলে এবং ইমামও তখন ‘আমীন’ বলে। সুতরাং যার ‘আমীন’ ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (সুনানে নাসাঈ হা.নং ৯২৭, আহমাদ: ২/২৭০, হা. নং ৭৬৬০, ইবনে হিব্বান হা.নং ১৮০৪)

সুতরাং বুঝা যায় যে, হাদীসের প্রথম অংশ (যা বুখারীর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে)-এর দ্বারা ‘আমীন’ বলার স্থান ও সময় বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ (যা ইবনে হিব্বান ও দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে অর্থাৎ, فان الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين ‘ফিরিশতারাও তখন ‘আমীন’ বলে এবং ইমামও তখন ‘আমীন’ বলে’) -এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ‘আমীন’-এর অবস্থা তথা আস্তে ‘আমীন’ বলা। ইমাম যদি জোরে আমীন বলতেন তাহলে-তো মুকতাদিগণ তা শুনতেই পেতেন। কাজেই ইমামের জোরে বলা উদ্দেশ্য হলে এ অংশটি বাড়িয়ে বলার কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া, ফিরিশতাদের সাথে বলতে হলে তাদের মতো ‘আমীন’ বলতে হবে। আর তারা-তো আস্তে ‘আমীন’ বলেন। সুতরাং আমাদেরও আস্তে ‘আমীন’ বলতে হবে।

(3) نْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: " لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " (رواه مسلم:415)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শেখাতেন। তিনি বলতেন, ইমামের পূর্বে কিছু করো না। যখন ইমাম তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন **ولا الضالين** পড়ে শেষ করবে, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলবে। ইমাম যখন রুকূ

করবে তোমরাও তখন রুকূ করবে। আর ইমাম যখন **سمع الله لمن حمده** বলবে, তখন তোমরা **اللهم ربنا لك الحمد** বলবে। (মুসলিম হা. নং ৪১৫)

এ হাদীসে মুক্তাদির জন্য তিনটি কাজ করার নির্দেশ এসেছে। যথা: তাকবীর, 'আমীন', আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ। প্রথম ও তৃতীয়টি সকলের মতে আস্তে বলতে হবে। বর্ণনার ধরন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় নির্দেশটিও আস্তে পালন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, তিনটি নির্দেশের দ্বিতীয়টি ভিন্নভাবে 'জোরে' বলতে হলে স্পষ্টভাবে সেটা বলে দেয়া হতো। এখানে সেটা করা হয়নি। সুতরাং 'আমীন' আস্তেই বলতে হবে।

(4) عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ (رواه احمد:5/23, والترمذى:251, وابو داود:480)

অর্থ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব ও হযরত ইমরান ইবনে হাসীন রা. পরস্পর আলোচনা করতেছিলেন। হযরত সামুরা রা. হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমার স্মরণ আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি স্থানে সাক্তাহ করতেন, অর্থাৎ চুপিসারে পড়তেন। একটি তাকবীরে তাহরীমা বলার পর, অর্থাৎ সানা। দ্বিতীয়টি ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ বলার পর, অর্থাৎ 'আমীন'। হযরত ইমরান ইবনে হাসীন রা. দ্বিতীয়টির স্বীকৃতি দিলেন না। তখন উভয়ে এ মাসআলা জানার জন্য হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর নিকট পত্র লিখেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. লেখেন, সামুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলটি সঠিকভাবেই স্মরণ রেখেছে। (তিরমিযী হা. নং ২৫১, সুনানে আবূ দাউদ হা. নং ৪৮০, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩, হা. নং. ২০০৮১)

‘নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সানা আস্তে পড়তেন’-এ ব্যাপারে উভয় সাহাবী একমত হয়ে গেলেন, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহার পরে ‘আমীন’ বলতেন কি না এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলো। একজন বলছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আমীন’ বলতেন, অন্যজন তা স্বীকার করলেন না। এর দ্বারা বুঝা গেলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আমীন’ সর্বদা আস্তে বলতেন। কারণ আওয়াজ করে বললে দু’জন সাহাবার মধ্যে ঐ বিষয়ে কখনো মত-পার্থক্য হতো না। অতএব, বুঝা গেলো যে, ‘আমীন’ আস্তে বলাটাই আসল আমল।

(5) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُخْفِي الإِمَامُ أَرْبَعًا :-
التَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.(المحلى بالاثار:2/280)

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা বলেন, হযরত উমর রা. বলেছেন, ইমাম চারটি জিনিস আস্তে পড়বে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ‘আমীন’ ও রাব্বানা লাকাল হামদ। (মুহাল্লা বিল আসার: ২/২৮০)

(6) عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُخْفِي الإِمَامُ ثَلاَثًا :-
الاِسْتِعَاذَةُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ (المحلى:2/280)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম তিনটি জিনিস আস্তে বলবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও ‘আমীন’। (আল-মুহাল্লা বিল আসার: ২/২৮০)

এবার উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধীদের উপস্থাপিত দলীল ও সেগুলোর খণ্ডনসহ জবাব উল্লেখ করা হচ্ছে:

জোরে ‘আমীন’ বলা সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে মূলকথা হলো: যেটি সহীহ সেটি দাবী প্রমাণে সুস্পষ্ট (**صريح**) নয়। আর যেটি সুস্পষ্ট (**صريح**) সেটি সহীহ নয়। যেমন:

যারা জোরে ‘আমীন’ বলার কথা বলেন, তারা তাদের দাবীর সমর্থনে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী দলীল ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.-এর নিম্নোক্ত হাদীস দু’টি দিয়ে পেশ করে থাকেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رواه البخارى:780, ومسلم:914)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ‘আমীন’ বলে তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো। কেননা যার ‘আমীন’ ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী হা.নং ৭৮০, মুসলিম হা.নং ৯১৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾বলে, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো। কেননা যার ‘আমীন’ ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী হা.নং ৭৮২, মুসলিম হা.নং ৪১০)

প্রথম হাদীসটি দ্বারা ইমাম বুখারীসহ অনেকে ইমামের জোরে ‘আমীন’ বলা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তারা এর অর্থ করেছেন, ‘ইমাম যখন শুনিয়ে ‘আমীন’ বলবে (যা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই), তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো’। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, হাদীসটির শুধু একটিই অর্থ নয়, আরো অর্থ হতে পারে। হাদীসটি-তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, কিন্তু এর কোনো নির্ধারিত অর্থ কারো কাছে বলে যাননি। ইমাম মালেক রহ. বংশগতভাবেই আরবী ভাষী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন। মালেকী মাযহাব মতে ইমাম ‘আমীন’ই বলবে না। তারা এ হাদীসের অর্থ

করেছেন, ‘ইমাম যখন ‘আমীন’ বলার স্থানে পৌঁছবে, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো।’ আবার অনেকে হাদীসটির অর্থ করেছেন, ‘যখন ইমাম ‘আমীন’ বলতে ইচ্ছে করবে, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলবে’। কেননা ইমাম, মুকতাদী ও ফিরিশতার ‘আমীন’ এক সাথে হওয়া কাম্য।

অর্থাৎ, এ হাদীস দ্বারা মূলত ‘আমীন’ বলার পদ্ধতি তথা জোরে বা আস্তে বলার বর্ণনা দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা আমীনের ফযিলত বুঝানো উদ্দেশ্য ছিলো; যাতে মুকতাদির ‘আমীন’, ইমাম ও ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায় এবং মুসলমানরা অতীতের সব গুনাহ মাফের ফযিলতে ধন্য হতে পারে।

‘আমীন’ বলার পদ্ধতি হলো আস্তে বলা। আর এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিতে, যা একটি বড় হাদীসের অংশ মাত্র। হাদীসটিতে নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইমাম-মুকতাদির কাজ ভিন্ন ভিন্ন করে বুঝানো হয়েছে, যা আমরা আমাদের ৩নং দলীলে উল্লেখ করেছি। মূল হাদীসের ধরন থেকে এটাই বুঝা যায় যে, মুকতাদিকে ইমামের পিছনে যেরূপ তাকবীর ও তাহমীদ (**ربنا لك الحمد**) আস্তে বলতে হয়, সেরূপ ‘আমীন’ও আস্তেই বলতে হবে। ভিন্ন কোনো দলীল ছাড়া শুধু এ হাদীসের সহায়তায় জোরে বলার অবকাশ নেই।

আর দ্বিতীয় কথা হলো, যদি প্রথম অর্থটিই ধরা হয়, তবুও জোরে ‘আমীন’ বলার ব্যাপারে এর নির্দেশনা সুস্পষ্ট নয় এবং এমন হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেক হাদীসে বলেন, فان الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين ‘ফিরিশতারাও তখন ‘আমীন’ বলে এবং ইমামও তখন ‘আমীন’ বলে’। পূর্বে বর্ণিত হাদীস দু’টিতে যদি জোরে ‘আমীন’ বলা বুঝানো হতো, তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক একথাটি ভিন্ন করে বলার কোনো প্রয়োজন হয় না। এ কথাটি ভিন্ন করে বলাই প্রমাণ করে যে, ইমাম ও ফিরিশতাদের ‘আমীন’ আস্তে হয়ে থাকে। অতএব, মুকতাদিদেরকে ফযিলত পেতে হলে তাদের সাথে মিল রেখে ‘আমীন’ আস্তেই বলতে হবে।

জোরে ‘আমীন’ বলার পক্ষে আরেকটি দলীল পেশ করা হয়, তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস দিয়ে। হাদীসটি হলো:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.وفي رواية أبي داود بلفظ: فقال آمين, وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. (رواه الترمذى:248, وابو داود:932)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়লেন ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ অতঃপর বললেন, ‘আমীন’ এবং ‘আমীন’ বলার সময় তার আওয়াজকে লম্বা করলেন। সুনানে আবূ দাউদের বর্ণনায় এসেছে: ‘নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আমীন’ বলার সময় তার আওয়াজকে উঁচু করলেন’। (তিরমিযী হা.নং ২৪৮, আবূ দাউদ হা.নং ৯৩২)

আল্লামা ইবনুল হুমাম-সহ অনেকে বলেন যে, জোরে ‘আমীন’ বলার এ হাদীস মূলত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। প্রকৃত ও স্থায়ী আমল হলো, আস্তে ‘আমীন’ বলা। যেমন, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো সিররী নামাযে এক-দুই আয়াত জোরে পড়তেন, হযরত উমর রা. কখনো কখনো “সানা” জোরে পড়তেন, হযরত আবূ হুরাইরা রা. কখনো কখনে **اعوذ بالله** জোরে পড়তেন। মুসল্লিদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করতেন। এর পক্ষে একটি স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. ইয়ামানবাসী সাহাবী ছিলেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে দীন শিক্ষা করার লক্ষ্যেই এসেছিলেন। ২০ দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুহবতে থেকে ষাট ওয়াক্ত জোরে ক্বিরা‘আতওয়ালা নামায তিনি পড়েছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঠিক পিছনে তার জন্য স্থান নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। ওয়াইল বিন হুজর রা. বলেন, এই ষাট ওয়াক্তের মধ্যে সাতান্ন ওয়াক্তে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস্তে ‘আমীন’ বললেন এবং মাত্র তিন ওয়াক্ত নামাযে ’আমীন’ জোরে বলেছিলেন। ফলে আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, এটা আমাকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই

করেছিলেন। (আল আসমাউ ওয়ালকুনা: ১/১৯৭, নাসাঈ হা.নং ৯৩২, মাজমাউজ যাওয়াইদ: ২/১১৩, শরহুল মাওয়াহিব: ৭/১১৩, শরহে বুখারী: দূলাবী প্রণীত।)

জোরে 'আমীন' বলাই যদি নবীজি সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত হতো, তাহলে হাদীসের মধ্যে এর সমর্থন-সূচক অনেক বর্ণনা থাকতো এবং আমলের ক্ষেত্রেও সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়তো। কেননা এটি হতো একটি করণীয় আমল। বর্জনীয় আমল হলে বর্ণনা কম হওয়ার সুযোগ থাকে। এ বিষয়টি সমাধানের জন্য খাইরুল কুরুনে প্রচলিত আমলের দিকে লক্ষ্য করুন! আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী রহ. বলেন, অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈদের আমল ছিলো আস্তে আমীন বলা। (মা'আরিফুস-সুনান: ২/৪১৮, সুনানে বাইহাকী (টীকা): ২/৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিষয়টি সহীহভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত

কওমা তথা রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা নিয়ে ফুক্বাহায়ে কিরামদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও এটা নিয়ে একপক্ষ অন্যপক্ষের সাথে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করেন না। আর এটা বাড়াবাড়ি করার মতো কোনো বিষয়ও নয়। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে কলম ধরতে হচ্ছে আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ভাইদের কল্যাণে (?)। আমরা নিম্নে রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার পক্ষে-বিপক্ষের দলীল তুলে ধরে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দেখাবো যে, এক্ষেত্রে হানাফীদের আমলই হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা সুপ্রমাণিত। আহলে হাদীস ভাইয়েরা যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে হানাফীদের বিপরীত আমল করেন সেটা বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

কওমা থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকার ব্যাপারে ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের দু'ধরনের মতামত রয়েছে। যথা:

(১) রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু যমীনে রাখবে। এরপর দুই হাত সিজদার স্থানে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাত যমীন থেকে উঠাবে। এরপর হাঁটু যমীন থেকে তুলবে।

(২) রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাত যমীনে রাখবে। এরপর দুই হাঁটু যমীনে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাঁটু যমীনে থেকে উঠাবে। এরপর দুই হাত যমীনে থেকে তুলবে।

প্রথম মতের প্রবক্তাগণ: হানাফী মাযহাবে প্রথম মত গ্রহণ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের মতামত যাদের থেকে বর্ণিত তারা হলেন, সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর মধ্য থেকে হযরত উমর রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা., হযরত আনাস রা., হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা., হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. প্রমুখ। তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈদের মধ্য থেকে ইবরাহীম নাখয়ী, ইবনে সীরীন, আবূ কিলাবাহ, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়া, সুফিয়ান সাওরীসহ আরো অনেক ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস রহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম তিরমিযী রহ.-এর ভাষ্যানুযায়ী 'অধিকাংশ ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিস প্রথম মতের প্রবক্তা এবং তারা এ অনুযায়ী 'আমল করে আসছেন।' (সুনানে তিরমিযী হা.নং ২৬৮, আল মুগনী ইবনে কুদামাহ : ১/৩০৩, যাদুল মাআদ : ১/২১৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৬৩, হা. নং ২৭১৭-২৭২৬)

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা: বর্তমান যামানার আহলে হাদীস (লা-মাযহাবী) নামধারী ফিরকা এ মত গ্রহণ করেছে।

প্রথম মতের পক্ষে হানাফীদের দলীল

(1) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন, 'আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু যমীনে রাখতে দেখেছি এবং উঠার সময় দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত যমীন থেকে উঠাতে

দেখেছি।' (সুনানে আবূ দাউদ হা.নং ৮৩৮, সুনানে তিরমিযী হা.নং ২৬৮, সুনানে দারেমী হা.নং ৩০৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা হা.নং ৬২৬, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আসার বাইহাকী: ৩/৬৪ শামেলা)

এ হাদীসের সনদকে ইমাম তিরমিযী এবং হাকেম নিশাপুরী রহ. যথাক্রমে হাসান এবং সহীহ বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া রহ.ও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সুনানে দারেমীতে হাদীসটিকে হাসান বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী কিতাবুল ঈমান: ৬/৫৩, যাদুল মাআদ: ১/২২৩)

(2) عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ.

অর্থ: 'হযরত সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, আমরা এক যামানায় সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখতাম, এরপর আমাদেরকে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে আদেশ করা হয়েছে।' (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৩/৩১৮, হা. নং ৬২৮)

(3 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فليبْتدئْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُروكَ الْفَحْلِ»

অর্থ: আবূ হুরাইরা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন প্রথমে যেনো দুই হাঁটু যমীনে রাখে, পুরুষ (উট)-এর মতো যেনো না বসে (অর্থাৎ, আগে যেনো হাত না রাখে, কারণ এটাই উটের বসার নিয়ম) ।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/২৬৩, হা. নং ২৭১৭)

এসব হাদীস দ্বারা রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মতামত দৃঢ়ভাবে সঠিক ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলো। এতদসত্ত্বেও এক্ষেত্রে লা-মাযহাবী ভাইদের হানাফী মাযহাব ছেড়ে অন্য মতামত গ্রহণ করা সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্যকোনো উদ্দেশ্যে হতে পারে না।

দ্বিতীয় মতের পক্ষে লা-মাযহাবীদের দলীল ও এর খণ্ডন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ

قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ»

অর্থ: ‘হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেনো দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত যমীনে রাখে। আর উটের মতো যেনো না বসে।’ (সুনানে নাসাঈ হা.নং ১০৯০, সুনানে আবূ দাউদ হা.নং ৮৪০, হাদীসটি অন্যান্য আরো হাদীসের কিতাবে আছে।)

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মিশ্র-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কেউ হাসান, কেউ সহীহ, কেউ যঈফ বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। আবার কেউ মুনকারও বলেছেন। যেমন, হামযাহ আল-কেনানী রহ. এ হাদীসকে মুনকার বলেছেন। (ফাতহুল বারী কিতাবুল ঈমান: ৬/৫৩)

তবে প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসের উপর অন্য কয়েকটি কারণে প্রাধান্য পায়। কারণগুলো ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) লা-মাযহাবীদের হাদীসটিকে সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে অনেক মুহাদ্দিস মানসূখ (রহিত) বলেছেন। যেমনঃ ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, ‘আমাদের মাযহাবের অনেক ফুক্বাহা এ হাদীসটিকে মানসূখ মনে করেন।’ (যাদুল মাআদ: ১/২১৫) তাছাড়া সহীহ ইবনে খুযাইমার সংকলকও এ হাদীসটিকে মানসূখ বলেছেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৩/৩১৮) আর ফুক্বাহায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসীন হযরত এ বিষয়ে একমত যে, মানসূখ হাদীস কোনো আমলের পক্ষে দলীল হতে পারে না। অতএব, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হযরত আবূ হুরাইরা রা.-এর হাদীস দ্বারা তাদের আমলের পক্ষে যে দলীল পেশ করছে সে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেটা মানসূখ, অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে।

(২) যদি আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত লা-মাযহাবীদের হাদীসটিকে মানসূখ না-ও মানা হয়, তাহলেও এর ‘মতন মুযতারিব’। অর্থাৎ, হাদীসের মূলপাঠ উলটপালট হয়ে গেছে। কারণ হাদীসটির প্রথম অংশে যে কাজ করতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে সেটাই নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাদীসের প্রথম অংশে

দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত রাখতে বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশে উটের মতো বসতে নিষেধ করে মূলত হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতেই নিষেধ করা হয়েছে। কেননা উট বসার সময় প্রথমে হাত তথা সামনের দুই পা যমীনে বিছায়। এরপর পিছনের দুই পা বিছিয়ে বসে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হযরত ওয়াইল ইবনে হুজুর রা. থেকে বর্ণিত মতনই সঠিক। আমাদের বর্ণিত তিন নং দলীলে খোদ হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় লা-মাযহাবীগণ আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করছে, সেটা বর্ণনা করার সময় কোনো বর্ণনাকারী ভুলবশতঃ শব্দ আগ-পিছ করে ফেলেছে। এ হিসেবে আবূ হুরাইরা রা.-এর হাদীস (যেটা লা-মাযহাবীদের দলীল)-এর মূলপাঠ আসলে এমন ছিলো: قَبْلَ يَدَيْهِ وَ لاَ يَبْرُكُ بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ

অর্থ: ‘তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেনো নিজ দুই হাঁটু দুই হাতের পূর্বে রাখে এবং উটের মতো যেনো না বসে।’

হাদীসের মূলপাঠ এমন ধরা হলে, হাদীসের প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয় না এবং আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত দু’টি হাদীস একটি আরেকটির বিপরীত হয় না।

এসব আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, লা-মাযহাবী ভাইদের দলীলটি ‘মুযতারিবুল মতন’ বা ‘মাকলূব’। আর মুযতারিব হাদীস দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ফলে রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার ব্যাপারে লা-মাযহাবী ভাইদের দলীলটি গ্রহণ করা গেলো না।

(৩) ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের পক্ষে একাধিক সাহাবী রা.-এর আমল রয়েছে। যেমন: হযরত উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হযরত আনাস প্রমুখ সাহাবা রা.। অথচ আবূ হুরাইরা রা.-এর হাদীসের উপর একমাত্র ইবনে উমর রা. ছাড়া অন্যকোনো সাহাবীর আমল পাওয়া যায় না। ইবনে উমর রা. থেকে আবার ওয়াইল ইবনে হুজর রা.-এর হাদীস অনুযায়ী

আমলও বর্ণিত আছে। তাই আবূ হুরাইরা রা.-এর হাদীসের উপর ইবনে উমর রা.-এর আমল থাকা, না থাকার মতোই।

(৪) নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে মুসল্লীদেরকে বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃস্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন: শিয়ালের মতো এদিক সেদিক তাকাতে, হিংস্র প্রাণীর মতো হাত বিছিয়ে রাখতে, কাকের মতো ঠোকর দিতে, কুকুরের মতো বসতে, অবাধ্য ঘোড়ার লেজ নাড়ার মতো বারবার হাত উঠাতে এবং উটের মতো সিজদায় যেতে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত আবূ হুরাইরা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করলে সিজদায় যাওয়ার সময় উটের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে বাঁচা যায় না। তাই সিজদায় যাওয়ার সময় উটের সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বাঁচার জন্য ওয়াইল ইবনে হুজর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। (বিস্তারিত দেখুন ‘যাদুল মাআদ : ১/২১৫, আল মুগনী ইবনে কুদামাহ : ৩০৩)

এসব কারণ বিবেচনায় এনে উম্মতের অধিকাংশ ফক্বীহ এবং মুহাদ্দিসগণ হযরত আবূ হুরাইরা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আমলযোগ্য মনে করতে পারেননি। তাই ১৪শ বছর ধরে তারা হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.-এর হাদীস অনুযায়ী আমল করে আসছেন। শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যেই লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত অগ্রহণযোগ্য হাদীসটিকে সম্বল বানিয়েছে। আর আবূ হুরাইরা রা. থেকে এ ব্যাপারে মা’মূলবিহী যে হাদীসটি ছিলো (আমাদের তিন নং দলীল) সেটি তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ সেটা গ্রহণ করার দ্বারা তো সমাজে ফিতনা-ফাসাদ ছড়ানো যাবে না! আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে হিদায়াত দান করুন। আমাদেরকে তাদের ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

প্রসঙ্গ: বিতর নামায

প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ও সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলমান পুরুষ ও মহিলার উপর ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করা ফরযে ‘আইন এবং বিতরের নামায আদায় করা ওয়াজিব। কোনো কারণে সময়মতো আদায়

করতে না পারলে এসব নামায কাযা করে নেয়া আবশ্যক। বিতর নামায আদায় করার নির্ধারিত সময় হলো: ইশার ফরজ ও সুন্নাত আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

বিতর নামায দুই বৈঠকে এক সালামে তিন রাকা'আত পড়তে হয়। এটাই নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল, সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও তৎপরবর্তী মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিক আমল।

বিস্তারিত আলোচনা নিম্নের শিরোনামগুলোর অধীনে পেশ করা হচ্ছে:

১. বিতর নামায তিন রাকা'আত।

ক. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল।
খ. সাহাবায়ে কিরামের আমল।
গ. তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের আমল।

২. এক সালামে তিন রাকা'আত বিতর ও দ্বিতীয় রাকা'আতে শুধু তাশাহহুদ।
৩. তৃতীয় রাকা'আতে রুকূর আগে দু'আয়ে কুনূত।
৪. দু'আয়ে কুনূতের আগে তাকবীর দিয়ে হাত উঠানো এবং পুনরায় হাত বাঁধা।
৫. দু'আয়ে কুনূত কী?
৬. এক রাকা'আত বিতরের দলীলসমূহ ও সেগুলোর পর্যালোচনা।

বিতর নামায তিন রাকা'আত

ক. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল: নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। অসংখ্য হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু হাদীস পেশ করা হলো:

(১) 'আবূ সালামা রহ. বলেন, আমি হযরত আয়িশা রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي

أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا»

অর্থ: রামাযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামায কেমন ছিলো? হযরত আয়িশা রা. বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানে ও রামাযানের বাহিরে এগারো রাকা‘আতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকা‘আত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। এরপর আরো চার রাকা‘আত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। এরপর তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১১৪৭, সহীহ মুসলিম: ৭৩৮)

এ হাদীসের বিশ্লেষণে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, তিনি চার রাকা‘আত পড়ে ঘুমাতেন। তারপর আবারো চার রাকা‘আত পড়ে ঘুমাতেন। অতঃপর উঠে তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। (আল ইস্তিযকার: ২/১০০)

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কয়েস রহ. বলেন, আমি হযরত আয়িশা রা.কে বললাম:

بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ».

অর্থ: নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতো রাকা‘আত বিতর পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন, চার (তাহাজ্জুদ) ও তিন (বিতর), ছয় (তাহাজ্জুদ) ও তিন (বিতর), আট (তাহাজ্জুদ) ও তিন (বিতর), দশ (৮ তাহাজ্জুদ ও ২ ফজরের সুন্নাত) ও তিন (বিতর) । তিনি বিতর সাত রাকা‘আতের কম ও তেরো রাকা‘আতের অধিক পড়তেন না। (সুনানে আবূ দাউদ: ১/১৯৩, হা. নং ১৩৬২, শারহু মাআনিল আসার: ১/২০১, মুসনাদে আহমাদ: ৬/১৪৯, হা. নং ২৫১৫৯)

আল্লামা ‘আইনী ও শুয়াইব আরনাউত এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. বলেন, এ ধরণের হাদীসগুলোতে

বিতরসহ রাতের পুরো নামাযকেই বিতর শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (সুনানে তিরমিযীর ৪৫৭ নং হাদীস-পরবর্তী বক্তব্য দ্রষ্টব্য।) হাফেজ ইবনে হাজার রহ. উপরোল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, আমার জানা মতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ হাদীস। বিতর বিষয়ে হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এ হাদীস দ্বারা সেসবের মাঝে সমন্বয় করা যায়। (ফাতহুল বারী: ৩/২৫)

আর এ হাদীসে সর্বাবস্থায় তিন রাকা'আত পৃথকভাবে পড়ার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায়, এটিই প্রকৃত বিতর।

(৩) সা'দ ইবনে হিশাম হযরত আয়িশা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন:

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ أَطْوَلَ مِنْهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لاَ يَفْصِلُ فِيهِنَّ."

অর্থ: ইশার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকা'আত নামায পড়তেন। অতঃপর আরো দুই রাকা'আত পড়তেন, যা পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হতো। তারপর তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন, তাতে মাঝে (দুই রাকা'আত শেষে) সালাম ফিরাতেন না। (মুসনাদে আহমদ হা. নং ২৫২২৩, এর সনদ হাসান)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে আট রাকা'আত নামায পড়তেন, অতঃপর তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বে আরো দুই রাকা'আত নামায আদায় করতেন। (সুনানে নাসাঈ: ১/২৪৯, হা. নং ১৭০৭, তহাবী: ১/২০২, আল্লামা 'আইনী রহ. বলেন, এটি সহীহ মুসলিমের মানোত্তীর্ণ। নুখাবুল আফকার: ৩/২৫১)

(৫) হযরত শা'বী রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে জিজ্ঞাসা করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাতের নামায কতো রাকা'আত ছিলো?

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالاَ: «ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ»

অর্থ: তারা উভয়ে বলেন, (তিনি রাতে) মোট তেরো রাকা'আত (নামায পড়তেন), প্রথমে আট রাকা'আত, অতঃপর তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। আর ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে দুই রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করতেন। (সুনানে নাসাঈ কুবরা হা. নং ৪০৮, ১৩৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ হা. নং ১৩৬১, তহাবী: ১/১৯৭, আল্লামা 'আইনী বলেন, এর সনদ সহীহ। নুখাবুল আফকার: ৩/২১১)

(৬) আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. তার পিতা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে শয্যা থেকে উঠলেন, এরপর মিসওয়াক করে উযু করলেন এবং দুই রাকা'আত নামায পড়লেন। এভাবে দুই দুই করে ছয় রাকা'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তিন রাকা'আত বিতর পড়লেন। সবশেষে আরো দুই রাকা'আত নামায পড়লেন। (সুনানে নাসাঈ: ১/২৪৯, হা. নং ১৭০৪, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৫০, হা. নং ৩২৭১, তহাবী: ১/২০১, ২০২। শুয়াইব আরনাউত বলেন, এর সনদ মজবুত ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী রয়েছে।)

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে:

...ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ.

অর্থ: ...অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে তিনবারে ছয় রাকা‘আত নামায আদায় করলেন। প্রতিবারেই মিসওয়াক ও উযু করেছেন এবং উপরিউক্ত আয়াতগুলো পড়েছেন, সব শেষে তিন রাকা‘আত বিতর পড়েছেন। (সহীহ মুসলিম: ১/২৬১, হা. নং ৭৬৩, সহীহ আবূ আওয়ানা: ২/৩২১)

সা’দ ইবনে হিশাম রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে হযরত আয়িশা রা.-এর কাছে পাঠান আর বলে দেন, তিনি কী বলেন আমাকেও জানাবে। অতঃপর সা’দ ইবনে হিশাম ফিরে এসে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তুমি সত্য বলেছো। সুযোগ থাকলে আমিই সরাসরি হযরত আয়িশা রা.-এর কাছ থেকে শুনে আসতাম। (সহীহ মুসলিম হা. নং ৭৪৬)

এতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর তাহাজ্জুদ-এর রাকা‘আত সংখ্যা ৪ ও ৮ হলেও বিতর নামাযের বিবরণে হযরত আয়িশা রা. ও ইবনে আব্বাস রা. উভয়ে একমত। হযরত আয়িশা রা.-এর বর্ণনায় যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেলো। অর্থাৎ, এগারো রাকা‘আত নামাযের শেষ তিন রাকা‘আত হলো বিতর এবং হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত সা’দ ইবনে হিশামের হাদীসে ষষ্ঠ রাকা‘আতে বসা কিন্তু সালাম না ফিরিয়ে উঠে পড়া মূলত তিন রাকা‘আত বিতরের দ্বিতীয় রাকা‘আত।

(৭) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা রা. বর্ণনা করেন:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الأُولَى: بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاَثًا , يَمُدُّ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ»

অর্থ: একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বিতর পড়লেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাকা‘আতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকা‘আতে সূরা ইখলাস পড়লেন। (তহাবী: ১/২০৫, আল্লামা ‘আইনী বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, নুখাবুল আফকার : ৩/২৭১, মুসনাদে আবী হানীফা- জামিউল মাসানীদ : ১/৪১৪, সুনানে নাসাঈ হা. নং ১৭৩৩, শুয়াইব আরনাউত ও মুহাম্মাদ আওয়ামা এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আত-তালখীসুল হাবীরে বলেন, *إسناده حسن* এর সনদ হাসান)

(৮) সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকা‘আতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকা‘আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। (সুনানে নাসাঈ: ১/২৪৯, হা. নং ১৭০৭, সুনানে তিরমিযী হা. নং ৪৬২, সুনানে দারিমী হা. নং ১৫৮৯, ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৫১২, হা. নং ৬৯৫১, মুসনাদে আহমাদ হা. নং ২৭৭৬। শুয়াইব আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ। ইমাম নববীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

(৯) হযরত উবাই ইবনে কা’ব রা. বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ

وفي رواية : وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَيَقُولُ ــ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ ــ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، ثَلاَثًا.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকা‘আতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা কাফিরূন, তৃতীয় রাকা‘আতে সুরা ইখলাস পড়তেন এবং রুকূর পূর্বে দু‘আয়ে কুনূত পড়তেন। একই হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে, “আর কেবল শেষ রাকা‘আতেই সালাম ফিরাতেন”। (সুনানে নাসাঈ : ১/১৯১, হা. নং ১৬৯৯, মুশকিলুল আসার : ১১/৩৬৮; আল্লামা ‘আইনী, ইবনুল কাত্তান, শাইখ শুয়াইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। স্বয়ং আলবানী সাহেবও ইরওয়াউল গালীল : ২/১৬৭-এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

(১০) হযরত আয়িশা রা. বলেন:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى: بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}،

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের প্রথম রাকা‘আতে সূরা আ’লা, দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকা‘আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। (তিরমিযী হা. নং ৪৬৩)

শেষের চারটি হাদীসে এ বিষয়ে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই যে, নবীজী তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। রাকা‘আতগুলোর বিবরণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। এছাড়া, অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈগণ এভাবেই তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. তার সুনানে তিরমিযীতে সু¯পষ্টভাবে বলেন:

وَالَّذِى اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ: بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ.

অর্থ: সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম (বিতরে) সূরা আ'লা, কাফিরূন ও ইখলাস পড়াকেই গ্রহণ করেছেন। (তিন রাকা'আতের) প্রতি রাকা'আতে একটি করে সূরা পড়বে। (সুনানে তিরমিযী 'বিতরে ক্বিরা'আত পাঠ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

এভাবে উনিশজন সাহাবী থেকে তিন রাকা'আত বিতরে তিন সূরা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (কাশফুস সিতর: পৃ. ৪৭, আল হিদায়া ফী তাখরীজি আহাদিসিল বিদায়া: ৪/১৪৮)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন:

فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب ركعة كان يقو بالناس عشرين في يرمضانو يوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك السنة لأنه أقامه بين المهاجرين و الأنصار و لم ينكره منكر .

অর্থ: বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তার ইমামতিতে লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকা'আত তারাবীহ, অতঃপর তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। অনেক উলামায়ে কিরাম মনে করেন, তারাবীহর এটিই প্রকৃত সুন্নাত। কারণ তিনি অনেক মুহাজির ও আনসারী সাহাবীর সামনে এ নামায পড়েছেন। তাদের কেউই এ আমলের বিরোধিতা করেননি, বা একে ভুল আখ্যা দেননি। (আল ফাতওয়াল কুবরা: ২/২৪৫)

খ. সাহাবায়ে কিরামের আমল:

(১) হযরত উমর রা. বলেন:

«مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ»

অর্থ: আমি তিন রাকা'আত বিতর পড়া ছাড়তে কখনোই পছন্দ করি না, যদিও এর বিনিময়ে আমাকে লাল উট উপহার দেয়া হয়। (কিতাবুল আসার, জামিউল মাসানীদ: ১/৪১৭, মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ: পৃ. ১৪৯, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ: ১/১৩৫)

(২) হযরত যাযান রহ. বলেন: **أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ**

অর্থ: হযরত আলী রা. তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং ৬৯১৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/৩৪, হা. নং ৪৬৯৯)

(৩) হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমায়ের রহ. বলেন: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং ৬৮৯৪)

(৪) হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. বলেন: أن أبي بن كعب يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ

অর্থ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/২৬, হা. নং ৪৬৬১)

(৫) হযরত হুমাইদ রহ. বলেন:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : الوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

অর্থ: হযরত আনাস রা. বলেছেন, বিতর তিন রাকা'আত এবং তিনি নিজেও তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং ৬৮৯৩, তহাবী: ১/২০২, সালাতুল বিতর লিল মারওয়াযী: পৃ. ২৬৪)

(৬) আবূ গালিব রহ. বলেন: كَانَ أَبُوْ أُمَامَةَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

অর্থ: হযরত আবূ উমামা রা. তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং ৬৮৯৬, তহাবী: ১/২০২)

গ. তাবেঈগণের আমল:

(১) হযরত ইসমাঈল ইবনে আব্দুল মালেক রহ. বলেন:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রহ. তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন এবং বিতর নামাযে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯৩, হা. নং ৬৯০৫)

عَنْ مَكْحُوْلٍ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

অর্থ: হযরত মাকহুল রহ. তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন এবং তিন রাকা'আত শেষে সালাম ফিরাতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯৩, হা. নং ৬৯০৬)

এছাড়াও হযরত আলক্বমা, ইবরাহীম নাখয়ী, জাবের ইবনে যায়েদ, হাসান, ইবনে সিরীন, ক্বাতাদাহ, বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আলমুযানী, মু'আবিয়া ইবনে কুররাহ, ইয়াজ ইবনে মু'আবিয়া রহ. প্রমুখ থেকেও তিন রাকা'আত বিতর পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

অর্থ: বিতর নামায তিন রাকা'আত হওয়ার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯২, হা. নং ৬৯০৪)

এক সালামে তিন রাকা'আত বিতর ও দ্বিতীয় রাকা'আতে শুধু তাশাহহুদ

(১) সাবেত আল বুনানী রহ. বলেন, হযরত আনাস রা. আমাকে বলেছেন, হে আবূ মুহাম্মাদ (সাবেতের উপনাম) আমার কাছ থেকে শিখে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি, আর তিনি আল্লাহ তা'আলা থেকে গ্রহণ করেছেন। তুমি শেখার জন্য আমার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য অন্য কাউকে পাবে না।

সাবেত আল বুনানী রহ. বলেন:

ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ يُسَلِّمُ فِيْ آخِرِهِنَّ.

অর্থ: অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামায পড়লেন। এরপর ছয় রাকা'আত নামায পড়লেন এবং প্রতি দুই রাকা'আতে সালাম ফিরালেন। তারপর তিন রাকা'আত বিতর পড়লেন এবং সবশেষে সালাম ফিরালেন। (তারীখে দিমাশক, ইবনে আসাকির: ৯/৩৬৩, আনাস ইবনে মালেক অধ্যায়। সুনানে তিরমিযী হা. নং ৩৮৩১। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ. বলেন,

এ হাদীসের সনদ মজবুত। তহাবী: ১/২০৬, ইবনে আবী শাইবাহ হা. নং ৬৯১০)

(২) সা'দ ইবনে হিশাম রহ. বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ» وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ».

অর্থ: আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন এবং শেষ রাকা'আতের পূর্বে সালাম ফিরাতেন না। মুস্তাদরাকে হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রা.ও বিতর এভাবে পড়তেন এবং তার কাছ থেকেই মদীনাবাসী এ আমল গ্রহণ করেছেন। (ইমাম হাকেম, যাহাবী, 'আইনী, নববী ও আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ. প্রমুখ হাদীসটি সহীহ বলেছেন। মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৩০৪, হা. নং ১১৮১, তহাবী: ১/১৯৩, নাসাঈ: ১/২২৮, হা. নং ১৬৯৮, ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯৩-৪৯৪ হা. নং ৬৯১৩, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ: ১/১৩৭)

উল্লেখ্য যে, হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম যাহাবী ও ইবনে হাযম জাহেরী রহ. প্রমুখ বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিতর নামায ছিলো তিন রাকা'আত এক সালামে, তবে তাতে মাগরিবের মতো মাঝে বৈঠক করতেন, কিন্তু সেই বৈঠকে সালাম ফিরাতেন না। (আত তানকীহ, যাহাবী: ১/৩২৬, আল মুহাল্লা: ২/৮৯, আত তাহকীক ফি মাসাইলিল খিলাফ ওয়াত তানকীহ লিবনি আব্দুল হাদী)

(৩) হযরত আয়িশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুরো নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ

وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করতেন তাকবীর দিয়ে এবং ক্বিরা‘আত শুরু করতেন ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ দিয়ে, রুকূতে মাথা উপরেও উঠাতেন না, আবার নিচেও নামাতেন না। বরং মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন। রুকূ থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। এক সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে না বসে আরেক সিজদা করতেন না। আর তিনি বলতেন, নামাযের প্রতি দুই রাকা‘আতেই একবার আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। (সহীহ মুসলিম হা. নং ১১৩৮)

(৪) হাবীব আল মুআল্লিম রহ. বলেন:

قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ أَفْقَهُ مِنْهُ، كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرِ»

অর্থ: হাসান বসরী রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কি (তিন রাকা‘আত) বিতরের দুই রাকা‘আতের পর সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকা‘আত পৃথক পড়তেন? তিনি বলেন, তার পিতা হযরত উমর রা. তার থেকে প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি (দ্বিতীয় রাকা‘আতে স্বাভাবিক নিয়মে বৈঠক শেষে সালাম না ফিরিয়ে) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম হা. নং ১১৪১, সুনানে কুবরা বাইহাকী হা. নং ৫০০৩, সালাতুল বিতর মারওয়াযী: পৃ. ২৭০। এ হাদীসের সনদ সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. মৌনভাবে এর সমর্থন করেছেন। ফাতহুল বারী: ২/৫৫৮)

(৫) আবূ ইসহাক রহ. বলেন:

«كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لاَ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ»

অর্থ: হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর শিষ্যগণ (তিন রাকা'আত) বিতরের দ্বিতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরাতেন না। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৪৯৩, হা. নং ৬৯১১, সালাতুল বিতর মারওয়াযী: পৃ. ২৭১)

(৬) আবূয যিনাদ রহ. বলেন:

عَنِ السَّبْعَةِ، سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , فِي مَشْيَخَةٍ سِوَاهُمْ أَهْلِ فِقْهٍ وَصَلَاحٍ وَفَضْلٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا. فَكَانَ مِمَّا وَعَيْتُ عَنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ: «أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» فَهَذَا مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَائِهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

অর্থ: আমি বিখ্যাত সাত ফক্বীহ অর্থাৎ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান, খারিজা ইবনে যায়েদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ.-এর যুগ পেয়েছি, যারা ইলম ও তাক্বওয়ায় অনবদ্য ছিলেন। নিজেদের মধ্যে কখনো মতভেদ হলে তাদের অধিকাংশের মত, কিংবা প্রাজ্ঞতার বিচারে যিনি অগ্রগণ্য তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। এ মূলনীতি অনুসারে তাদের যেসব সিদ্ধান্ত আমি ধারণ করেছি তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তারা সকলে একমত হয়েছেন বিতর নামায তিন রাকা'আত, আর কেবল শেষ রাকা'আতে সালাম ফিরাবে।

ইমাম তহাবী বলেন: সুতরাং বোঝা যায়, মদীনার যেসকল ফক্বীহ ও আলেমের নাম উল্লেখ করা হলো তারা এ বিষয়ে একমত যে, বিতর তিন রাকা'আত এবং একটি সালাম হবে তিন রাকা'আত পূর্ণ করেই। (তহাবী: ২/২০৭, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য- আল্লামা 'আইনী, নুখাবুল আফকার: ৩/২৮৯)

(৭) হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. তার পূর্বসূরী তাবেঈদের বিতর নামাযের বিবরণে বলেন:

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَأَ، فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، وَيَنْهَضُ، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

অর্থ: তারা তিন রাকা'আত বিতরের প্রথম রাকা'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা কাফিরূন পড়তেন। তারপর বসে তাশাহহুদ পড়ে আবার উঠে দাঁড়াতেন এবং তৃতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। (সালাতুল বিতর মারওয়াযী: পৃ. ২৭৯। ইবনে হাজার রহ. বলেন, এর সনদ সহীহ। নাতাইযুল আফকার: ২/১১৪,৫০৩)

(৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ».

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দিনের বিতর হলো মাগরিবের নামায। তোমরা রাতের নামাযকেও অনুরূপ বিতর করে পড়ো। (ইবনে আবী শাইবাহ হা. নং ৬৭৭৩, ৬৭৭৮, আব্দুর রাযযাক হা. নং ৪৬৭৫, মুসনাদে আহমাদ হা. নং ৪৮৪৭। শায়েখ শুয়াইব আরনাউত বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন:

وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ جَعَلَ الْمَغْرِبَ وِتْرَ صَلَاةِ النَّهَارِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِثْلَهَا، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمٍ، كَمَا لا يَفْصِلُ فِي الْمَغْرِبِ بِتَسْلِيمٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ

অর্থ: আমরা এ বর্ণনাটি গ্রহণ করি: যে ব্যক্তি ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্য অনুযায়ী বিতরকে মাগরিবের নামাযের অনুরূপ মনে করে তার উচিত মাগরিবের মতোই বিতর পড়া, যাতে দুই রাকা'আতের পর সালাম না ফিরায়। এটিই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভিমত। (মুয়াত্তা মালেক, ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনা: পৃ.১৪৯)

৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ».

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দিনের বিতর অর্থাৎ, মাগরিবের মতো রাতের বিতরও তিন রাকা‘আত। (সুনানে দারাকুতনী হা. নং ১৬৭২। হাদীসটি হাসান পর্যায়ের, তবে অনেকেই এটিকে ইবনে মাসউদ রা.-এর বক্তব্য হিসেবে সহীহ বলেছেন।)

(১০) হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন:

«كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»

অর্থ: হযরত উবাই ইবনে কা’ব রা. তিন রাকা‘আতে বিতর পড়তেন এবং তাতে মাগরিবের মতোই তৃতীয় রাকা‘আতের আগে সালাম ফিরাতেন না। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ৪৬৫৯, ৪৬৬০। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ فَكَذَلِكَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ .

অর্থ: আর একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, মাগরিবের নামায তিন রাকা‘আত, তিন রাকা‘আত পূর্ণ করেই তবে সালাম ফিরানো হয়। ঠিক তেমনি রাতের বিতরও। (আল ইস্তিযকার: ৫/২৮৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ বলে থাকেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের মতো বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন, তাই বিতর এক রাকা‘আত পড়বে। আর তিন রাকা‘আত পড়লেও দুই রাকা‘আত পড়ে সালাম ফিরাবে, অথবা দ্বিতীয় রাকা‘আতে বৈঠক না করে সোজা দাঁড়িয়ে তিন রাকা‘আত পূর্ণ করবে। কিন্তু বিতরের দুই রাকা‘আতে মাগরিবের মতোই বৈঠক হবে, তবে সালাম ফিরাবে না- এর দলীল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিতরকে মাগরিবের নামাযের মতো পড়তে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কী? এ বিষয়ে যথার্থ বক্তব্য হলো- বিতরের ক্ষেত্রে শরী‘আতের কাম্য হচ্ছে কিছু নফল নামায পড়ার পর আদায় করা। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

«لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

অর্থ: তোমরা শুধু তিন রাকা'আত বিতর পড়ো না। এতে মাগরিবের মতো হয়ে যাবে। বরং পাঁচ, সাত, নয়, এগারো বা এর অধিক রাকা'আতে বিতর পড়ো। (মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৩০৪, হা. নং ১১৩৭, সুনানে কুবরা বাইহাকী: ৩/৩১,৩২) অর্থাৎ, বিতরের আগে কিছু নফল নামায অবশ্যই পড়ো। দুই-চার-ছয়-আট যতো রাকা'আত সম্ভব হয় পড়ে নাও। 'বিতরের নামায তিন রাকা'আত' বিষয়ক আলোচনার 'ক'-এর দ্বিতীয় হাদীসে হযরত আয়িশা রা. থেকে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন এবং দশ ও তিন এরূপ বিভিন্ন সংখ্যায় রাতের নামায পড়তেন, যেখানে তিন রাকা'আত ছিলো বিতর।

নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিতর নামায সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন হযরত আয়িশা রা.। তিনি বলেন:

«لاَ يُوتَرُ بِثَلاَثٍ بَتْرَاءَ صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا»

অর্থ: শুধুই তিন রাকা'আত বিতর না পড়া উচিত, এটি অপূর্ণ নামায। বরং এর পূর্বে দু'চার রাকা'আত পড়ে নাও। (ইবনে আবী শাইবাহ হা. নং ৬৮৬৭। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।)

নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিতর নামাযের প্রত্যক্ষদর্শী অপর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন:

«إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلاَثًا , وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا»

অর্থ: শুধুই তিন রাকা'আত রাতের নামায পড়া আমি অপছন্দ করি, বরং অন্তত পাঁচ থেকে সাত রাকা'আত পড়া উচিত। অর্থাৎ, বিতরের সাথে দু'চার রাকা'আত নফল পড়া উত্তম।

ইমাম তহাবী রহ. এ বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন-

فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ أَنَّهُ يُوتِرُ وِتْرًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَطَوُّعٌ , وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ إِمَّا رَكْعَتَانِ وَإِمَّا أَرْبَعٌ.

অর্থাৎ, আগে কোনো নফল নামায না পড়ে কেবলই তিন রাকা'আত বিতর পড়াকে তিনি অপছন্দ করেন। তার মতে বিতরের পূর্বে অন্তত দুই বা চার রাকা'আত নফল নামায পড়া উচিত। (তহাবী: ১/২০৩, আল্লামা 'আইনী, ইবনে আব্বাসের সনদকে সহীহ বলেছেন। নুখাবুল আফকার: ৫/৮০)

আশাকরি, এসকল বর্ণনা দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিতর নামায তিন রাকা'আত এক সালামে দুই বৈঠকে পড়তে হবে।

তৃতীয় রাকা'আতে রুকূর আগে দু'আয়ে কুনূত

হযরত আসেম রহ. বলেন:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ القُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ، قَالَ: كَذَبَ «إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ...

অর্থ: আমি হযরত আনাস রা.কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ কুনূত আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রুকূর আগে না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। বললাম, একজন আমাকে বললো- আপনি রুকূর পরে কুনূত পড়ার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে ভুল বলেছে। রুকূর পরে তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এক মাস কুনূত পড়েছেন। (যা ছিলো মূলত কুনূতে নাযেলা) (সহীহ বুখারী হা. নং ৪০৯৬)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন:

وَقَدْ وَافَقَ عَاصِمًا عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَمَا فِي الْمَغَازِى بِلَفْظِ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لاَ بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَمَجْمُوعُ مَا جَاءَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقُنُوتَ لِلْحَاجَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ لاَ خِلاَفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا لِغَيْرِ الْحَاجَةِ فَالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

অর্থ: আব্দুল আযীয ইবনে সুহাইব, আসেম-এর উপরিউক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যা মাগাযী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সে বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তি আনাস রা.কে জিজ্ঞাসা করলো- কুনূত রুকূর পরে পড়বে, না (রুকূর আগে) ক্বিরা'আত শেষ হওয়ার পর? তিনি উত্তরে বলেছেন, ক্বিরা'আত শেষ হওয়ার পরে পড়বে। ইবনে হাজার রহ. বলেন, কুনূত সম্পর্কে হযরত আনাস রা. থেকে যতোগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলোর সারনির্যাস হচ্ছে, যে কুনূত বিশেষ উদ্দেশ্যে (কুনূতে নাযেলা) পড়া হয় তা হবে রুকূর পরে। আনাস রা. থেকে সকল বর্ণনায়ই একথা এসেছে। আর সাধারণ কুনূত যা সবসময় পড়া হয় তা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেলেও রুকূর আগে পড়ার কথাই হলো সহীহ বর্ণনা। (ফাতহুল বারী: ২/৫৬৯)

এ ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের আস্থাভাজন আলেম নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব বলেন:

وَ ذٰلِكَ أَنَّهٗ قَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمَ أَنَّهٗ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ كَمَا يَأْتِيْ بَعْدَ حَدِيْثٍ , وَ يَشْهَدُ لَهٗ آثَارٌ كَثِيْرَةٌ عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ كَمَا سَنُحَقِّقُهٗ فِي الْحَدِيْثِ الْآتِيْ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالٰى

وَ الْخُلَاصَةُ أَنَّ الصَّحِيْحَ الثَّابِتَ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ الْقُنُوْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فِي الْوِتْرِ، وَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيْثِ الْآتِيْ.

অর্থ: সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর নামাযে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন, যার আলোচনা একটি হাদীস পরেই আসবে। উপরন্তু, বিশিষ্ট সাহাবীদের থেকে বর্ণিত অনেক আসারও হাদীসের বিশুদ্ধতার পক্ষে শক্ত দলীল। সারকথা হলো- সাহাবীদের থেকে সহীহ সূত্রে এটিই প্রমাণিত যে, বিতরের কুনূত রুকূর পূর্বে পড়তে হবে। (ইরওয়াউল গালীল: ২/১৬৬)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর পড়তেন এবং রুকূর আগে কুনূত পড়তেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ হা. নং ১১৮২)

হযরত আলক্বামা রহ. বলেন:

«أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী বিতর নামাযে রুকূর আগে কুনূত পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৫২০, হা. নং ৬৯৮৩)

এছাড়া, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., বারা রা., আবূ মুসা আশআরী রা., আনাস রা. ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. থেকেও রুকূর আগে কুনূত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

দু‘আয়ে কুনূতের আগে তাকবীর দিয়ে হাত উঠানো ও কুনূত পড়াকালে হাত বেঁধে রাখা

হযরত আসওয়াদ রহ. বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ»

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. দু‘আয়ে কুনূত পড়ার আগে দুইহাত উঠাতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৫৩১)

হযরত আসওয়াদ রহ. অন্য বর্ণনায় বলেন:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ، كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ»

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বিতর নামাযে ক্বিরা‘আত শেষে কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর দিতেন। এরপর কুনূত শেষ করে আবারও তাকবীর দিতেন। অতঃপর রুকূ করতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ: ৪/৫৩০, হা. নং ৭০২১)

এ দুই রিওয়ায়াত থেকে বোঝা যায়, হযরত ইবনে মাসউদ রা. দু'আয়ে কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর বলে হাত উঠাতেন।

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন:

أَنَّ «الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى قَبْلَ الْقُنُوتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَضَعُهُمَا، وَيَدْعُو. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অর্থ: রামাযানে ও অন্যান্য মাসে রুকূর পূর্বে বিতর নামাযে কুনূত পড়া ওয়াজিব। সুতরাং যখন দু'আয়ে কুনূত পড়বে তখন তাকবীর দিবে এবং যখন রুকূ করবে তখনও তাকবীর দিবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, এ মতটিই আমরা অবলম্বন করি। তিনি দু'আয়ে কুনূত পড়ার পূর্বে প্রথম তাকবীর দেয়ার সময় হাত উঠাতেন, যেভাবে নামায শুরু করার সময় হাত উঠাতেন। অতঃপর হাত বাঁধতেন এবং দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। এটিই আবূ হানীফা রহ.-এর অভিমত। (কিতাবুল আসার, মুহাম্মাদ রহ.-এর রিওয়ায়াত হা. নং ২১২)

দু'আয়ে কুনূত কী?

(১) আবূ আব্দুর রহমান আস সুলামী রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেনো কুনূতে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ি:

عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ».

শব্দের সামান্য ভিন্নতাসহ অন্যান্য বর্ণনায়ও এ দু'আ এসেছে। যেমন, এক বর্ণনায় **ونؤمن بك ونتوكل عليك** বাক্য বর্ধিত করে এসেছে। (ইবনে আবী

শাইবাহ: ১৫/৩৪৪, হা. নং. ৬৯৬৫। তহাবীর এক বর্ণনায় **ونشكرك** শব্দটিও রয়েছে। তহাবী: ১/১৭৭, হা. নং ১৪৩৮, এর সনদ সহীহ।)

অতএব, বর্ণনাগুলির আলোকে পূর্ণ দু'আটি নিম্নরূপে পড়া যায়:

عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ».

হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রতিদিন বিতর নামাযে এ দু'আটিই পড়তেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ৪৯৬৯, তবারানী আল আওসাত: ৫/২১৪, মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল: পৃ. ২৯৭)

(২) সুনানে বাইহাকীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত জিবরীল আমীন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুনূত শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর শব্দের সামান্য তারতম্যসহ উপরিউক্ত দু'আটি উল্লেখ করা হয়েছে। (বাইহাকী: ২/২১০, আল মুদাওয়ানাহ: ১/১০১। বর্ণনাটি মুরসাল এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। নাতাইজুল আফকার ইবনে হাজার: ২/১১১)

(৩) বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. নিজে বিতরের কুনূতে এ দু'আ পড়াকে পছন্দ করতেন এবং অন্যকে পড়তে আদেশ করতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/১২১, হা. নং. ৪৯৯৭, ইবনে আবী শাইবাহ: ২/৩০১, হা. নং ৬৮৯২)

(৪) হযরত 'আমর রহ. বলেন, তাবেঈ হযরত হাসান বসরী রহ. বিতর ও ফজরের কুনূতে এ দু'আটি পড়তেন (বি:দ্র: এ হাদীসে বর্ণিত ফজরের কুনূতকে ইমাম শাফিঈ রহ. গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য ইমামগণ বিশেষ কারণে তা গ্রহণ করেননি) । তাকে একজন জিজ্ঞাসা করলো, এ দু'আয় অতিরিক্ত আর কিছু পড়া যায় কি? তিনি উত্তরে বললেন:

"لاَ أَنْهَاكُمْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزِيدُونَ عَلَى هَذَا شَيْئًا، وَيَغْضَبُ إِذَا أَرَادُوهُ عَلَى الزِّيَادَةِ."

অর্থ: তোমাদের আমি নিষেধ করবো না, তবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণকে এর অতিরিক্ত কিছু পড়তে দেখিনি। বরং কেউ অতিরিক্ত কিছু বাড়ালে তারা রাগ করতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/১১৬, হা. নং ৪৯৮২)

তাই হানাফী ফক্বীহগণ ও ইমাম মালেক রহ. এ দু‘আকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন:

قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَ مَالِكٌ: وَ لَيْسَ فِي الْقُنُوْتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّوْنَ أَلاَّ يَقْنُتَ إِلاَّ بِقَوْلِهِمْ "اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ ...".

অর্থ: কূফার অধিবাসী আহলে ‘ইলমগণ ও ইমাম মালেক রহ. বলেন, দু‘আয়ে কুনূত সুনির্দিষ্ট নয়, তবে তারা এ দু‘আটি পড়া উত্তম মনে করেন। (আল ইসতিযকার: ২/২৯৫)

আরেকটি দু‘আ:

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিতর পড়ার জন্য আরেকটি দু‘আ শিক্ষা দিয়েছেন। দু‘আটি নিম্নরূপ:

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

(সুনানে আবূ দাউদ: ১/৫২৬, হা. নং ১৪২৫, সুনানে নাসাঈ: ১/২৫২, হা. নং ১৭৪৫, জামে তিরমিযী: ১/১০৬, হা. নং ৪৬৪, ইবনে মাজাহ: ১/১৮৫, হা. নং ১১৭৮, মুসনাদে আহমাদ হা. নং ১৭১৮)

তাই অনেকে উভয় দু‘আ একত্রে পড়তেন।

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন,

"كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَجْعَلُوا، فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ، وَهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَيَدْعُو بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ."

অর্থ: আমি আমার পূর্বসূরীদের দেখেছি তারা বিতর নামাযে উপরিউক্ত দুটি দু'আ পড়াকেই উত্তম মনে করতেন। (দু'আর অর্থ:) ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমার উত্তম প্রশংসা করি। তোমার না-শুকরি করি না। যে তোমার অবাধ্য হয় তাকে আমরা পরিত্যাগ করি ও তার সংশ্রব বর্জন করি। ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদাত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি, তোমার দিকেই ধাবিত হই, আর তোমারই দাসত্ব অবলম্বন করি। আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি, তোমার আযাবের ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফিরদের উপর পতিত হবে।

ইয়া আল্লাহ! যাদেরকে আপনি হিদায়াত দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও হিদায়াত দিন। যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও নিরাপত্তা দিন। যাদেরকে আপনার তত্ত্বাবধান নসীব করেছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করুন। আমাকে যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন। আর আমাকে আপনার অকল্যাণের ফয়সালা থেকে হিফাজত রাখুন। কেননা আপনিই ফয়সালাকারী, আপনার উপর কোনো ফয়সালাকারী নেই। নিশ্চয়ই আপনি যাকে সাহায্য করেন, সে কখনো লাঞ্ছিত হয় না। আর যাকে আপনি সাহায্য-বঞ্চিত করেন সে কখনো সম্মান লাভ করে না। হে আমাদের রব! আপনি মহান সমুচ্চ। (মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, মারওয়াযী: ১/৩২১)

পরবর্তী সময়ের হানাফী ফক্বীহদের অনেকেই উভয় দু'আ একত্রে পড়াকে পছন্দ করেছেন। (দেখুন! মাবসূতে সারাখসী: ১/১৬৫, বাদাইউস সানায়ে: ২/২৩২)

এক রাকা'আত বিতরের সমর্থনে উপস্থাপিত দলীল ও সেগুলোর পর্যালোচনা

এক রাকা'আত বিতরের পক্ষে যেসব হাদীস পেশ করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

1.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ». -رواه ابن ماجه (1174)

2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رواه مسلم (752)

3. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. رواه البخارى (990)

4. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: فَمَشَيْتُ أَنَا وَذَاكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ» . رواه أحمد (5537)

5. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رواه أبو داود (1422)

6. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» رواه ابن ماجه (1170)

এখানে বাহ্যিকভাবে এক রাকা'আতের পক্ষে ছয়টি হাদীস আছে বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। প্রথম চারটি হাদীস, যেগুলো ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; সেগুলো মূলত একটি হাদীস, অথবা বলা যেতে পারে দু'টি বর্ণনা। পরবর্তী রাবীগণের বর্ণনার ভিন্নতার দরুন হাদীসের শব্দের মধ্যে ভিন্নতা এসেছে। ফলে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে চারটি হাদীস। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণনা দু'টি এক রাকা'আতের সমর্থনে কোনো দলীল হয় না।

প্রথম চারটি হাদীসের পর্যালোচনা

ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনার কী উদ্দেশ্য?

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বিতর বিষয়ক বর্ণনাটি হযরত নাফে, আবূ সালাম, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ বারেকী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ, আবূ মিজলায, আতিয়া ইবনে সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান, উকবা ইবনে হুরাইছ, ত্বাউস, আনাস ইবনে সীরীন রহ. প্রমুখ (১৫ জন) তাবেঈগণ বর্ণনা করেছেন। (দেখুন! আল মুসনাদুল জামে হা. নং ৭৪১৪-৭৪২৯, ১০/১৯৫-২০৮, কাশফুস সিতর আন সালাতিল বিতর-কাশমিরী: পৃ. ২৬)

আনাস ইবনে সিরীন রহ. ব্যতীত অন্য চৌদ্দজনের বর্ণনা মূলত একই ঘটনার বিবরণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জবাবে মিম্বরে অবস্থানরত অবস্থায়ই হাদীসটি ইরশাদ করেন। সুতরাং হাদীসটি কওলী তথা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য। সবগুলো হাদীসই মূলত একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা। শুধু আনাস ইবনে সিরীনের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে উমর রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে নামায পড়তেন। এ থেকে বোঝা যায়, হাদীসটি কর্মবিষয়ক বিবরণ এবং এটি একটি ভিন্ন হাদীস। সুতরাং ধারণা হয় যে, ইবনে উমর রা. থেকে এ বিষয়ে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত:

يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ / وَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ / فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهٗ مَا قَدْ صَلَّى / وَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ

এ জাতীয় শব্দগুলো মূলত বিভিন্ন বর্ণনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ। তাই মুসনাদে বাযযারের সংকলক বলেন:

وَ هٰذَا الْحَدِيْثُ قَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ أَوْ قَرِيْبٌ

অর্থ: এ হাদীসটি ইবনে উমর রা. থেকে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে সবগুলি বর্ণনার অর্থ একই বা কাছাকাছি। (দেখুন! আল বাহরুয যাখখার হা. নং ৬১৫৪)

আর এ জাতীয় বাক্য থেকে এক রাকা'আত বিতরের পক্ষে স্পষ্ট দলীল হয় না। কেননা, এরূপ একটি বাক্যে আছে (**يوتر بركعة**), যার অর্থ যেমন 'এক রাকা'আত বিতর পড়তেন' হতে পারে, তেমনি এও হতে পারে 'এক রাকা'আতের মাধ্যমে বিতর পূর্ণ করতেন'। অর্থাৎ, পূর্বের দুই রাকা'আতের সাথে এক রাকা'আত যোগ করে বিতর (বেজোড় তথা তিন) করে নিতেন। অন্য বাক্যে আছে (**صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى**), 'এক রাকা'আত পড়ে নিবে যা পূর্বের দুই রাকা'আত নামাযকে বিতর বানিয়ে দিবে'। অর্থাৎ, বিতর এক রাকা'আত নয়, বরং এক রাকা'আত সংযোজিত হয়ে পূর্বের নামাযকেও বিতর বানিয়ে দিবে।

তাই ইবনে উমর রা. কর্তৃক মৌখিক বর্ণনা থেকে এক রাকা'আত বিতর পড়ার কোনো স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় না। বরং এতে বিতর তিন রাকা'আত দুই সালামে বা তিন রাকা'আত এক সালাম ও দুই বৈঠকে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কেননা-

ক. ইবনে উমর রা. থেকে একাধিক সূত্রে এসেছে (**صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى**), এক রাকা'আত পড়ে নিবে যা পূর্বের আদায়কৃত দুই রাকা'আত

নামাযকে বিতর করে দিবে। অর্থাৎ, বিতর এক রাকা'আত নয়। বরং পূর্বের দুই রাকা'আত নামাযও বিতরের মধ্যে শামিল হয়ে গেলো।

খ. ইবনে উমর রা. যখন বিতর পড়তেন তখন তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন, তবে দুই সালামে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. -(رواه مالك في الموطأ :406)

সুতরাং ইবনে উমর রা. নিজেই বুঝেছেন বিতর তিন রাকা'আত। সাহাবী বর্ণিত অস্পষ্ট হাদীসের ক্ষেত্রে সাহাবীর নিজস্ব আমলই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। ইবনে উমর রা.-এর আমলই বলে দেয়, এ হাদীসে বর্ণিত বিতর নামায তিন রাকা'আত।

গ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে সহীহ সনদে আছে (**صلاة المغرب وتر النهار**) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ হা. নং ৬৭৭৩)

এক রাকা'আত বিতরের মতাদর্শী আলেম আব্দুল্লাহ আল কাফী স্বরচিত বিতর সালাতে এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন এবং তিনি বলেছেন এখানে রাকা'আতের সংখ্যার দিক থেকে বিতরকে মাগরিবের মতো বলা হয়েছে। (পৃ. ৩২-৩৩)

এ হাদীসে মূলনীতিরূপে ইবনে উমর রা. বলেছেন, মাগরিব হলো দিনের বিতর। সুতরাং রাতের বিতরকেও মাগরিবের অনুরূপ করে পড়ো। ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্যই প্রমাণ করে তিনি জানতেন, বিতর নামায তিন রাকা'আত। আর তাই এটা আলোচ্য হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ. ইমাম শা'বী রহ.-এর সূত্রে একটি সহীহ বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রা.-এর মতো ইবনে উমর রা.ও নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাতের নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ হা. নং ১৩৬১)

ঙ. তাবেঈ আবূ মিজলায রহ. হাদীসটি ইবনে উমর রা. ও ইবনে আব্বাস রা. দুজন থেকেই বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা. নং ১৭৯৩) এতে বোঝা যায় মূল বর্ণনাটি ইবনে আব্বাস রা.ও শুনেছেন। তথাপি ইবনে আব্বাস রা. বিতর

এক সালামে তিন রাকা'আতই পড়তেন এবং এক রাকা'আত পড়া অপছন্দ করতেন। (আরো দেখুন! সুনানে ইবনে মাজাহ হা. নং ১২৩১, আল মু'জামুল কাবীর তবারানী হা. নং ১০৯৬৩, আন নুকাতুত্তরীফা: পৃ. ১৮৬, কাশফুস সিতর: পৃ. ৩২)

চ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. "এক রাকা'আত পড়ে নাও"-বাক্যে এক রাকা'আত বিতর পড়ার বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, এতে এক রাকা'আত বিতরের পক্ষে স্পষ্ট দলীল নেই, আবার "দুই সালামে তিন রাকা'আত বিতর পড়া" (অর্থাৎ দুই রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরেক রাকা'আত যোগে মোট তিন রাকা'আত বিতর)-এর পক্ষেও স্পষ্ট দলীল হয় না। হতে পারে এতে উদ্দেশ্য হলো, পূর্বের পড়া দুই রাকা'আতের সাথে মিলিয়ে এক সালামে মোট তিন রাকা'আত বিতর পড়ো। অথচ তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিখ্যাত হাফেজে হাদীস। তার মতে, বিতর দুই সালামে তিন রাকা'আত। তবুও তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিতর মূলত তিন রাকা'আত, এক রাকা'আত নয়। সম্ভবত এ কারণেই এক রাকা'আত বিতর নামাযের ইঙ্গিত বহনকারী এ ধরণের হাদীস বর্ণনা করার পরও ইমাম আবূ হানীফা রহ.সহ মুয়াত্তা সঙ্কলক ইমাম মালেক, মুসনাদ সঙ্কলক ইমাম আহমাদ রহ. প্রমুখ, অন্যান্য অনেক ইমামের মতোই এক রাকা'আত বিতর পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। (কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ: ১/১৯৩, আল ইশরাফ: ২/২৬২ ও আল আওসাত: ৮/১৬০, মাসাইলে আহমাদ ইবনে হানী: পৃ. ১/৯৯, ফাতহুল বারী ইবনে রজব হাম্বলী: ৬/১৯৯)

এমনকি, ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, বিতর ছুটে গেলে তিন রাকা'আতই কাযা করবে। (ফাতহুল বারী ইবনে রজব: ৬/২২৭)

পঞ্চম হাদীস

এক রাকা'আত বিতরের সমর্থকদের পঞ্চম হাদীস হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটির অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে পাঁচ রাকা'আত পড়তে চায় সে যেনো তা-ই পড়ে। যে তিন রাকা'আত পড়তে চায় সে যেনো তা-ই পড়ে। এবং যে এক রাকা'আত পড়তে চায় সে যেনো তা-ই পড়ে।

পর্যালোচনা: ক. বর্ণনাটি মউকূফ তথা সাহাবীর কথা। এক রাকা'আত বিতরের সমর্থকগণ এ বর্ণনাটিকে মারফূ তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ইমাম ইবনে আব্দুর বার রহ. বলেন, ইমাম নাসাঈ রহ. বর্ণনাটি মউকূফ তথা সাহাবীর বক্তব্য হওয়াকে বিশুদ্ধ মনে করেন। (আত তামহীদ: ১৩/২১৯) ইমাম দারাকুতনী মউকূফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (দেখুন! কিতাবুল ইলাল দারাকুতনী হা. নং ১০০৫, সুনানে দারাকুতনী হা. নং ১৬৩০, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার হা. নং ১৩৯৪)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইমাম আবূ হাতেম, যুহলী, দারাকুতনী, বাইহাকী এবং আরো একাধিক ইমাম রহ. এ বর্ণনাটিকে মউকূফ বলেছেন। আর এটিই সঠিক। (আত তালখীসুল হাবীর: ২/৩৬, ৩৭)

খ. হাদীসের অংশবিশেষ গোপন করা।

এ হাদীসেরই একটি অতিরিক্ত অংশ বিশুদ্ধ সনদে সুনানে নাসাঈতে রয়েছে (হাদীস নং ১৭১৩), যার বাক্যাংশটি হলো-

وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيْمَاءً

যার ইচ্ছা এক রাকা'আত পড়ে নিবে, আর যার ইচ্ছা একটি ইশারা করে নিবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ৪৬৩৩, সুনানে কুবরা বাইহাকী: ৩/২৪ হা. নং ৪৭৭৯, ৪৭৮০, সহীহ ইবনে হিব্বান হা. নং ২৪১১)

এ বর্ণনার আলোকে বলা যায়, বিতরের নামায ইশারা করে নিলেই আদায় হয়ে যাবে। বাস্তবে কি তা শুদ্ধ হবে? একটু ইশারা করলেই বিতর আদায় হয়ে যাবে? কখনো না। বরং এ হাদীসের উভয় অংশ ব্যাখ্যার দাবি রাখে, যাতে অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে সংঘর্ষ না থাকে।

ষষ্ঠ হাদীস

তাদের ছয় নং হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীরা! তোমরা বিতর পড়ো।”

তারা বলেন, হাদীসটিতে সরাসরি আল্লাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ এক বেজোড়, না তিন বেজোড়, না পাঁচ বেজোড় তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

পর্যালোচনা: (ক) ইবনে মাসউদ রা.-এর উল্লিখিত বর্ণনাও এক রাকা‘আত বিতরের দলীল নয়। কারণ, উল্লেখযোগ্য কোনো মুহাদ্দিস বা ফক্বীহ এ হাদীস দিয়ে এক রাকা‘আত বিতরের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হাদীসের বক্তব্য হলো- আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। (বিতর নামাযও যেহেতু বেজোড়) তাই বিতরের নামায আদায় করো / বিতরকেও বেজোড় করে পড়ো। এখানে শুধু বিতর নামায বেজোড় করে আদায়ের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাই ইমাম নববীসহ অনেক মুহাদ্দিসই হাদীসটিকে “বিতর নামাযে উৎসাহ প্রদান” অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। (খোলাসাতুল আহকাম হা. নং ১৮৫৪)

(খ) বর্ণনাকারী সাহাবীগণ এ হাদীস থেকে ‘এক’ সংখ্যাটি বুঝেননি। অর্থাৎ, ‘বিতর নামায এক রাকা‘আত’ এ হাদীস থেকে তারা এরূপ বুঝেন নাই। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরী রা. এবং তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন ও আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. সকলেই বুঝেছেন, ‘আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন’- এর দ্বারা আল্লাহর সাথে তুলনা করে এক সংখ্যা বোঝানো হয়নি বরং এক, তিন, পাঁচ সব বেজোড় সংখ্যাই আল্লাহর কাছে প্রিয়- বুঝানো হয়েছে। নিম্নের বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করুন:

১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর উপস্থিতিতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা নিজে বেজোড় এবং বেজোড়কে তিনি পছন্দ করেন।

অতঃপর অনেকগুলো বেজোড় বস্তুর কথা উল্লেখ করেন। যেমন: আসমান-যমিন সাতটি। সপ্তাহে সাত দিন। সূরা ফাতিহার আয়াত-সংখ্যা সাত (যাকে কুরআনে বলা হয়েছে সাবউল মাসানী), সাফা মারওয়া ও কা'বার তাওয়াফ সাতবার। সিজদা করতে হুকুম করেছেন সাত অঙ্গের উপর ইত্যাদি। (দেখুন! আত তামহীদ: ২/১০, হিলয়াতুল আওলিয়া: জীবনী নং ১১৫৭)

২. হযরত ইবনে উমর রা. থেকে এ হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত নাফে রহ. বলেন, ইবনে উমর রা. সব কাজই বেজোড় করতেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৫৮৪৬)

৩. হযরত আবূ হুরাইরা রা. এ হাদীস বর্ণনা করার পর অনেকগুলো বেজোড় বস্তুর সাথে আসমানকেও বেজোড় হিসেবে গুণলেন। অতঃপর তিনি বলেন, যারা মিসওয়াক করবে, ইস্তিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করবে ও কুলি করবে তারা যেনো বেজোড় করে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৯০৮৩)

বলা-বাহুল্য, ঢিলা ব্যবহার ও কুলি করার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম হলো তিনবার করা, একবার নয়।

৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করতে হুকুম করে বলেন, তোমরা একে রামাযানের শেষ দশকে বিতর তথা বেজোড় সংখ্যার রাতে তালাশ করো। কেননা আল্লাহ বিতর এবং তিনি বিতর তথা বেজোড় পছন্দ করেন। (মুসনাদে আবূ দাউদ তয়ালিসী: ১২৮০)

৫. হযরত নাফে রহ. বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাওয়াফ সমাপ্ত করতেন বেজোড় সংখ্যায়, আর বলতেন- আল্লাহ তা'আলা বিতর এবং তিনি বিতর পছন্দ করেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ৯৮০০)

৬. মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. এ হাদীসের কারণে সবকিছুকেই বেজোড় করে করতেন। এমনকি কোনোকিছু খেলেও তা বেজোড় করে খেতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ৯৮০১)

৭. এ হাদীসের কারণেই হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন, তিন আঙ্গুল (অর্থাৎ বেজোর সংখ্যা) আমার কাছে চার আঙ্গুল (জোড় সংখ্যা) থেকে প্রিয়। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৯৮০৩)

(গ) এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। অথচ তিনি এ হাদীস থেকে এক রাকা'আত বিতর বোঝা তো দূরের কথা, এক রাকা'আতকে তিনি নামাযই মনে করতেন না। (কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ: ১/১৯৩,১৯৭)

স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এক রাকা'আত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبَتِيْرَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا (رواه ابن عبد البر في التمهيد (254/13)

(ঘ) সর্বোপরি, হাদীসের এ অংশবিশেষের ব্যাখ্যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম যে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর আল্লাহ বিতর (বেজোড়), তিনি বিতর পছন্দ করেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ৬৪১০, মুসলিম হা. নং ২৬৭৯)

(ঙ) এ হাদীসে যদি শুধু এক রাকা'আত বিতর পড়া উদ্দেশ্য হতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা-ই করতেন। অথচ শুধু এক রাকা'আত বিতর পড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একবারের জন্যও প্রমাণিত নয়।

কতিপয় সাহাবী রা.-এর এক রাকা'আত বিতর পড়া বিষয়ক বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা:

১. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.-এর এক রাকা'আত বিতর পড়ার কথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এক রাকা'আত বিতর কখনো যথেষ্ট হবে না। (কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ: ১/১৯৩,১৯৭

মুয়াত্তা মুহাম্মাদ হা. নং ২৬৪, আল মু'জামুল কাবীর-তবারানী হা. নং ৯৪২২; আল্লামা হাইসামী রহ. মাজমাউয যাওয়াইদে বলেন, এর সনদ হাসান।)

ইমাম মালেক রহ. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও 'উসমান রা.-এর বিতর প্রসঙ্গে বলেন: لَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَفْعٌ

অর্থাৎ, আমাদের এ অঞ্চলে তথা মদীনায় দুই রাকা'আত যুক্ত করা ছাড়া শুধু এক রাকা'আত বিতর আদায় করার কোনো আমল নেই। (কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ: ১/১৯৩)

২. হযরত মু'আবিয়া রা. এক রাকা'আত বিতর পড়লে এক বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে আব্বাস রা. তার কাজের কড়া সমালোচনা করেন। (তহাবী হা. নং ১৭৫০)

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপরিউক্ত উভয় বর্ণনাতেই হঠাৎ করে এক রাকা'আত বিতর পড়তে দেখে উপস্থিত তাবেঈগণ বিস্মিত হয়ে সাথে সাথে প্রশ্ন তুলেছেন। এতেও প্রমাণ হয়, এভাবে কেবল এক রাকা'আত বিতর সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন না, বা কাউকে তারা এরূপ করতে দেখেননি।

৩. হযরত উসমান রা.-এর এক রাকা'আত বিতর পড়ার বিষয়টি ছিল অনিচ্ছাকৃত। এক্ষেত্রেও ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত আব্দুর রহমান আত তাইমী রা. এক রাকা'আত বিতর পড়তে দেখে অবাক হন এবং পরক্ষণেই তিনি বলেন, أو هم الشيخ তিনি হয়তো ভুলে গেছেন। (তহাবী: পৃ. ২০৬)

৪. ইবনে উমর রা. আর ইবনে আব্বাস রা.-এর যে মারফূ রিওয়ায়াতে এক রাকা'আত বিতর পড়তে হুকুম করা হয়েছে, মূলত সেগুলোতে শুধুই এক রাকা'আতকে পৃথক পড়তে বলা হয়নি। একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বিদ্যমান, যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বিতরের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অধিকাংশ সাহাবী থেকে বর্ণিত নেই, (বরং তাদের আমল ছিলো এর বিপরীত) সে পদ্ধতিকেই হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থ সাব্যস্ত করা এবং এ দাবী করা যে, 'এটিই

সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত'-এ যে কতো বড় ভুল ও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলই এক রাকা'আত বিতর পড়েছেন, এর কোনো প্রমাণ নেই। (আত তালখীসুল হাবীর: ২/৩১, কাশফুস সিতর: পৃ. ৩৮)

অনুরূপভাবে, ইমাম তহাবী রহ. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুধু এক রাকা'আত বিতর বিষয়ে কিছু বর্ণিত হয়নি। (তহাবী হা. নং ১৬০৯)

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ রহ. শুধু এক রাকা'আত বিতর পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। (আল আওসাত ইবনুল মুনযির: ৫/১৮৪, মাসাইলে আহমাদ ইবনে হানী: ১/৯৯)

আল্লাহ আমাদের সকলকে সহীহ দীনী বুঝ দান করুন। আমীন।

শরঈ প্রমাণপত্রের আলোকে তারাবীহের রাকা'আত সংখ্যা

তারাবীহের রাকা'আত-সংখ্যা কোনোযুগেই মতভেদ বা উচ্চবাচ্যের বিষয় ছিলো না। ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা সাহাবাযুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি যুগেই হারামাইন শরীফাইনসহ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মসজিদে সর্বসম্মতভাবে ২০ রাকা'আত করেই তারাবীহ আদায় হয়ে আসছিলো।

এ উপমহাদেশের মাটিতে কুচক্রী ইংরেজ সম্প্রদায় জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসার পর থেকেই দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। তারা মুসলমানদের গৌরবময় ঐক্য ও সম্প্রীতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে সে সুযোগে নিজেদের খুঁটি পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে বেশকিছু নীল-নকশা আঁটে। সেগুলোই অন্যতম একটি হচ্ছে, ইসলামের সোনালীযুগ থেকে সর্বসম্মত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার বিপরীতে পরিত্যক্ত, ভ্রান্ত ও বিচ্যুতিপূর্ণ, মুনকার মতকে উস্কে দিয়ে সরলমনা মুসলিমদের মাঝে স্থায়ী-বিভেদ ও অনৈক্যের দেয়াল তুলে দেয়া। এ হীন চক্রান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের পদলেহনকারী কিছু লোক বাগিয়ে

নিতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে ইংরেজদের তৈরি এজেন্ডা নিয়ে আলেম নামধারী কতিপয় অপরিণামদর্শী ও বিপথগামী ব্যক্তি আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। তারাবীহের রাকা'আত সংখ্যা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা তাদের সেই এজেন্ডারই একটি অংশ। তাই সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশে এক লা-মাযহাবী আলেমের কণ্ঠে তারাবীহ নামায আট রাকা'আত হওয়ার দাবি উঠে, যে-ব্যক্তি ইংরেজদের থেকে নিজ সম্প্রদায়ের নাম 'আহলে হাদীস' মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলো।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, তাদের মতাদর্শেরই আরেক আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল সাহেব ১২৯০ হিজরীতে লা-মাযহাবীদের এই অলীক দাবিকে খণ্ডন করে 'রিসালায়ে তারাবীহ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু এতেও তারা ক্ষান্ত হলো না। কারণ, তাদের মূল এজেন্ডাই ছিলো মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামকে দুর্বল করা।

বর্তমানে আমাদের দেশে লা-মাযহাবীদের দৌরাত্ম অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা নিত্যনতুন ফিতনা সৃষ্টির মাধ্যমে সরলপ্রাণ মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করছে, যেগুলোর মধ্যে তারাবীহ নামাযের রাকা'আত সংখ্যা অন্যতম। তাই এ বিষয়ে সহীহ দলীলভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ মুসলমান তাদের প্রতারণা বুঝতে সক্ষম হয়।

২০ রাকা'আত তারাবীহ-এর দলীলসমূহ নবীযুগে তারাবীহ

(১) হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»، قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (مسلم: الترغيب فى صلاة التراويح:259/1)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একরাতে মসজিদে তারাবীহ পড়লেন। সাহাবীগণও তার সঙ্গে নামাযে শামিল হলেন। দ্বিতীয় রাতে মুকতাদী-সংখ্যা আরও বেড়ে গেলো, এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহের জন্য বের হলেন না। প্রত্যুষে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে, এ আশঙ্কায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি। (সহীহ মুসলিম হা. নং ৭৬১)

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ». (المصنف لابن أبي شيبة:288/2)

অর্থ: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে ২০ রাকা‘আত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৪, হা. নং ৭৬৯২)

(**আরও দ্রষ্টব্য:** আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি আব্দ ইবনে হুমাইদ: পৃ. ২১৮, হা. নং ৬৫৩; আস-সুনানুল কুবরা [বাইহাক্বী]: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬১৫; আল-মু’জামুল কাবীর [তবারানী]: ১১/৩১১, হা. নং ১২১০২; আল মুজামুল আওসাত [তবারানী]: ১/৪৪৪, হা. নং ৮০২; আত তামহীদ [ইবনে আব্দুল বার]: ৮/১১৫; আল ইসতিযকার: ৫/১৫৬)

পর্যালোচনা: হাদীসটির সনদে ইবরাহীম ইবনে ‘উসমান নামক একজন যঈফ রাবী থাকায় একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তবে তিনি বেশী যঈফ তথা মাতরূক বা পরিত্যাজ্য নন। (দ্রষ্টব্য: আল কামিল ইবনে আদী : ১/৩৮৯-৩৯৩২; তাহযীবুত তাহযীব : ১/১৪৪; ই’লাউস সুনান : ৭/৮২-৮৫)

উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি অনুসারে যঈফ দুই প্রকার:

(১) যে যঈফ সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতের বক্তব্য শরী'আতের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক, সে ধরনের যঈফ কোনো-অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়।

(২) যে যঈফ সনদের বক্তব্যের সমর্থনে শরী'আতের অন্যান্য দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগণের সিদ্ধান্ত হলো, সে রিওয়ায়াতকে 'যঈফ' বলা হলেও তা হবে শুধু 'সনদ'-এর বিবেচনায় এবং নিতান্তই নিয়ম-রক্ষামূলক; কিন্তু বক্তব্য ও মর্মের বিচারে সেটি সহীহ।

উসূলে হাদীসের উপরিউক্ত নীতির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের অসংখ্য উদ্ধৃতির মধ্য হতে এখানে শুধু দু'টি উদ্ধৃতি পেশ করছি:

(১) ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আন নুকাত'-এ লিখেন:

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ عُمِلَ بِهٖ عَلَى الصَّحِيْحِ, حَتّٰى يَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ. (النكات على مقدمة ابن الصلاح:390/1)

অর্থ: 'যঈফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগণের) কাছে সমাদৃত হয়, তখন সে হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে, এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা মুতাওয়াতির (বিপুল-সংখ্যক সূত্রে ধারাবাহিক বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।' (আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ: ১/৩৯০)

(২) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ' (১/৪৯৪)-এ লিখেন:

وَ مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُوْلِ أَنْ يَتَّفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَدْلُوْلِ الْحَدِيْثِ، فَإِنَّهٗ يُقْبَلُ حَتّٰى يَجِبَ الْعَمَلُ بِهٖ، وَ قَدْ صَرَّحَ بِذٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الأُصُوْلِ. (النكات على كتاب ابن الصلاح:494/1)

অর্থ: 'কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি নিদর্শন এই যে, ইমামগণ ঐ হাদীসের বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এরূপ অবস্থায় হাদীসটি

গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।

(এ হাদীসের বিষয়ে আরো আলোচনা ই'লাউস সুনান: ৭/৮২-৮৪; মুহাদ্দিস হযরত হাবীবুর রহমান আযমী রহ. লিখিত 'রাকা'আতে তারাবীহ': ৬৩-৬৯ এবং মাওলানা আমীন সফদর রহ. লিখিত 'তাহকীকে মাসআলায়ে তারাবীহ': ১/২০৫-২১৩ (মাজমূআয়ে রাসায়েল) ইত্যাদি কিতাব দ্রষ্টব্য)

অতএব, হাদীসটি 'আভিধানিক' যঈফ হলেও উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা লা-মাযহাবী বন্ধুগণের কাছেও এটি অবশ্য-পালনীয় সাব্যস্ত হতে আর কোনো বাধা রইলো না।

খিলাফতে রাশেদার যুগে তারাবীহ

নবীযুগের বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ ওহী অবতীর্ণ হওয়া ও শরী'আতের বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার যুগ থাকায় জামা'আতের সাথে নিয়মিত তারাবীহ নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিলো। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবীহের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেন নি। বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ ঘরে আদায় করে নিতে বলেছিলেন। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে (হযরত উমর রা.-এর তত্ত্বাবধানে) নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়ার আমল শুরু হয়। ফলে বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়া সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

অর্থ: তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো। (সুনানে তিরমিযী হা. নং ২৬৭৬)

অতএব, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতও নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের মতোই অনুসরণীয়।

২য় খলীফা হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকাল: উমর রা. কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবীহের জামা'আতের সূচনা সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেঈ আব্দুর রহমান আল ক্বারী রহ.-এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

عن عبد الرحمن القارئ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي لأُرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

لكان أمثل, فجمعهم على بى بن كعب, ...ألخ (مؤطامالك:442)

অর্থ: 'আমি রামাযান মাসে উমর রা.-এর সঙ্গে মসজিদে গিয়ে দেখলাম লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারাবীহ পড়ছেন। কেউ একা পড়ছেন, আবার কেউ দু' চারজনকে সঙ্গে নিয়ে পড়ছেন। তখন উমর রা. বললেন : 'এদের সকলকে যদি এক ইমামের পিছনে জামা'আতবদ্ধ করে দেই তাহলে মনে হচ্ছে উত্তম হয়।' এরপর তাদেরকে তিনি উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর পিছনে জামা'আতবদ্ধ করে দিলেন। (মুআত্তা মালেক হা. নং ৪৪২)

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) মুআত্তা মালেকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তামহীদ'-এ বলেন:

"উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নতুন কিছু করেন নি, তিনি তা-ই করেছেন যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করতেন এবং ৩/৪ দিন আমল করেও দেখিয়েছেন। কিন্তু নিয়মিত জামা'আতের কারণে তারাবীহের নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে, এ আশংকায় তিনি স্থায়ীভাবে জামা'আতের ব্যবস্থা করেন নি। উমর রা. এ বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর এখন আর ফরয হওয়ার ভয় নেই (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরী'আত নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে)। তাই তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিলের তামান্না অনুযায়ী ১৪ হিজরীতে জামা'আতের ব্যবস্থা

করে দেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্যাদা তার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর মনে এ চিন্তা আসেনি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।" (আত তামহীদ : ৮/১০৮-১০৯)

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন:

عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلى بالليل فى رمضان فصلى بهم عشرين ركعة

অর্থ: উমর রা. আমাকে রামাযানের রাতে লোকদেরকে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানীঈ, ইতহাফুল খিয়ারতিল মাহারাহ; ৩-৬৪, হা. নং ২০১৮)

২. সাহাবী হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা.-এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

«كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ»

(السنن الكبرى للبيهقى:1/267-268, بيهقى:2/305)

অর্থ: 'আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং বিতর পড়তাম।' (আস-সুনানুস সুগরা [বাইহাকী]: ১/২৭৮, হা. নং ৮৩৩; মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার [বাইহাকী]: ৪/৪২, হা. নং ৫৪০৯)

৩. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. থেকে বর্ণিত:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً»

(مصنف ابن أبى شيبة:2/393)

অর্থ: উমর ইবনে খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে লোকদের ২০ রাকা'আত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৩, হা. নং ৭৭৬৪)

৪. হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রহ. থেকে বর্ণিত:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (فِي رَمَضَانَ) بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً (مؤطا مالك:صـــ40)

উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর যুগে মানুষ (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন) রামাযান মাসে সর্বমোট ২৩ রাকা'আত আদায় করতেন' (২৩ রাকা'আত-এর মধ্যে ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং ৩ রাকা'আত বিতর ছিলো) । (মুআত্তা মালেক: পৃ-৪০, হা. নং ৪৪৮; আস্-সুনানুল কুবরা [বাইহাকী]: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬১৮)

পর্যালোচনা: উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোর মূল-বক্তব্য মুতাওয়াতির হওয়ায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। তথাপি লা-মাযহাবী বন্ধুদের অভিযোগ হলো, এ বর্ণনাগুলো মুরসাল, আর মুরসাল হলো যঈফ। অথচ এটা প্রমাণিত যে, তাবেঈ ইমামগণের 'মুরসাল' বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। দলীলের আলোকে পূর্বসূরী ইমামগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। উপরন্তু, যদি একই বক্তব্যের উপর একাধিক মুরসাল রিওয়ায়াত থাকে, কিংবা মুরসাল বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা বিদ্যমান থাকে, তাহলে যারা মুরসালকে যঈফ বলেছেন তারাও এটাকে সহীহ বা দলীলযোগ্য মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য উদ্ধৃতির মধ্য থেকে এখানে শুধু আমাদের লা-মাযহাবী ভাইদের 'আস্থাভাজন' ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বক্তব্যটিই উদ্ধৃত করছি :

وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الَّذِى لَهُ مَا يُوَافِقُهُ، أَوْ الَّذِى عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاء

(إقامة الدليل على بطلان التحليل, الفتاوى الكبرى:179/4)

অর্থ: 'যে মুরসালের সমর্থনে অন্যকোনো বর্ণনা পাওয়া যায়, কিংবা পূর্বসূরীগণ যার উপর আমল করেছেন তা ফক্বীহগণের সর্বসম্মতিতে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।' (ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহলীল আল ফাতাওয়াল কুবরা: ৪/১৭৯, আরো দ্রষ্টব্য: মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া: ২৩/২৭১; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা: ৪/১১৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ প্রসঙ্গেই বলেছেন:

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُوْمُ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ. (مجموعة الفتاوى:113-112/23)

অর্থ: ‘এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা’ব রা. রামাযানের তারাবীহতে মুসল্লীদের নিয়ে ২০ রাকা‘আত পড়তেন এবং তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন।’ (মাজমূ‘আতুল ফাতাওয়া: ২৩/১১২-১১৩)

২০ রাক‘আত তারাবীহ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন:

ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ: ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত।’ (প্রাগুক্ত)

৩য় খলীফা হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকাল: হযরত উসমান রা.-এর যুগেও তারাবীহ ২০ রাকা‘আত পড়া হতো।

হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন:

" كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً " قَالَ: " وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ "

(بيهقى: عدد ركعات القيام فى رمضان 496/2 رجاله ثقات: أثار السنن)

অর্থ: উমর রা.-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহের নামায ২০ রাকা‘আত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরা পড়তেন। উসমান রা.-এর যুগে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তাদের অনেকে লাঠিতে ভর দিতেন।’ (সুনানে বাইহাকী: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬১৭)

৪র্থ খলীফা হযরত আলী রা.-এর খিলাফতকাল: চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা.ও স্বীয় খিলাফতকালে তারাবীহের নামায ২০ রাকা‘আত পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

(১) আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী রহ. বলেন:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً " قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ "

(بيهقى:496/2عدد ركات القيام فى مضان)

অর্থ: আলী রা. রামাযান মাসে ক্বারীদেরকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, তারা যেনো লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়েন। আর বিতর পড়াতেন স্বয়ং আলী রা.। (সুনানে বাইহাকী: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬২০)

(২) আবূল হাসনা রহ. থেকে বর্ণিত-

عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ , أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً» (مصنف ابن أبى شيبة:2.393)

অর্থ: 'হযরত আলী রা. এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিলেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৩, হা. নং ৭৭৬৩)

(৩) ইমাম হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত:

حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ رضـــ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِىْ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْقِيَامِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يُرَاوِحَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَيَرْجِعَ ذُو الْحَاجَةِ وَ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَ اَنْ يُوْتِرَ بِهِمْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِيْنَ الاِنْصِرَافِ. (مسند الإمام زيدصـــ139)

অর্থ: 'হযরত আলী রা. যে ইমামকে রামাযানে তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে বলেছিলেন সে যেনো লোকদেরকে ২০ রাকা'আত তারাবীহের নামায পড়ায়, প্রতি দুই রাকা'আত অন্তর সালাম ফিরায় এবং প্রতি চার রাকা'আতে বিরতি দেয়, যাতে কারও প্রয়োজন থাকলে তা সেরে উযূ করে নিতে পারে, এবং সবশেষে প্রত্যাবর্তনকালে বিতর পড়িয়ে দেয়।' (মুসনাদে ইমাম যায়দ: পৃ. নং ১৩৯)

সাহাবায়ে কিরামের তা'আমুল ও ইজমা

(১) আ'মাশ রহ. বলেন:

عَنْ أَعْمَشُ قَالَ: «كَانَ (ابن مسعود رضـــ) يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ»

(مروزى قيام الليل: صـــ157)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. ২০ রাকা'আত তারাবীহ এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন। (কিয়ামুল লাইল: পৃ. ১৫৭)

(২) মোল্লা আলী আল-ক্বারী রহ. বলেন:

أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. (مرقات:194/3)

'সাহাবায়ে কিরাম রা. তারাবীহের নামায ২০ রাকা'আত হওয়ার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।' (মিরকাত: ৩/১৯৪)

(৩) ফিক্বহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আল-ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার'-এ হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন:

وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ التَّرَاوِيحِ وَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ؟ فَقَالَ: التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَمْ يَتَخَرَّصْهُ عُمَرُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلاَّ عَنْ أَصْلٍ لَدَيْهِ وَعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَقَدْ سَنَّ عُمَرُ هَذَا وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلاَّهَا جَمَاعَةً وَ الصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ: مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ الْعَبَّاسُ وَ ابْنُهُ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ مُعَاذٌ وَأُبَيٌّ وَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الأَنْصَارِ، وَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، بَلْ سَاعَدُوهُ وَ وَافَقُوهُ وَ أَمَرُوا بِذَلِكَ. (الاختيار لتعليل المختار: للأمام أبي الفضل مجد الدين الموصلى 70/1)

অর্থ: 'আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.কে তারাবীহ এবং এ বিষয়ে উমর রা.-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি এর উত্তরে বলেছেন: তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং উমর রা. তা নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি। তিনি এক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কারও করেননি। তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার ভিত্তিতেই এ আদেশ দান করেছেন। তাছাড়া, যখন উমর রা. এ নিয়ম চালু করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্র করে দেন, (যদ্দরুন সবাই এ নামাযটি জামা'আতের সাথে আদায় করতে

থাকেন) তখন সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে উসমান, আলী, ইবনে মাসঊদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, তালহা, যুবায়ের, মু'আজ ও উবাই রা. প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তাদের কেউই এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং সবাই তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন, তার সাথে একমত হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও এ আদেশ করেছেন।' (আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার [ইমাম আবূল ফযল মাজদুদ্দীন আল মাওসিলী]: ১৭০)

(৪) ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. 'আল ইসতিযকার' গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. (الاستذكار:157/5)

'এটি উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোনো ভিন্নমত নেই।' (আল ইসতিযকার: ৫/১৫৭)

(৫) ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী রহ. বলেন:

مَا فَعَلَهُ عُمَرُ، وَ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ أَوْلَى بِالاِتِّبَاعِ. (المغنى: 604/2)

উমর রা. যা করেছেন এবং তার খিলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, তা-ই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত।'

(আল মুগনী: ২/৬০৪, আরও দ্রষ্টব্য: কিয়ামুল লাইল: পৃ.৯১ ও ১৫৮, কিতাবুল আসার {ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.} পৃ.৪১; বাইহাকী: ২/৪৬৬; ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৩; ফাতাওয়া কাযীখান: পৃ.১১০; তাহযীবুল কামাল: ১৩/৫৯)

আইম্মায়ে সালাফের ইজমা

(১) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ভাষায়:

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ..... فَرَأَى كَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذٰلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ. (مجموعة الفتاوى:113-112/23)

অর্থ: ‘এটা প্রমানিত যে, উবাই ইবনে কা’ব রা. রামাযানের তারাবীহে লোকদের নিয়ে ২০ রাকা‘আত পড়তেন এবং তিন রাকা‘আত বিতর পড়তেন। তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত, এটিই সুন্নাত। কেননা, উবাই ইবনে কা’ব রা. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই ২০ রাকা‘আত পড়িয়েছেন এবং কেউ তাতে আপত্তি করেননি।’ (মাজমূ‘আতুল ফাতাওয়া: ২৩/১১২-১১৩)

(২) ইমাম যাবীদী রহ. বলেন:

وَ بِالإِجْمَاعِ الَّذِىْ وَقَعَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ رضـــ أَخَذَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ النَّوَوِىُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ الْجُمْهُوْرُ وَ اخْتَارَه ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. (إتحاف سادة المتقين:422/3)

অর্থ: উমর রা.-এর যুগে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত্যকেই অবলম্বন করেছেন ইমাম আবূ হানীফা, নববী, শাফিঈ এবং সকল ইমামগণ। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীন: ৩/৪২২)

(৩) ইমাম আবূ বকর কাসানী রহ. বলেন:

(بدائع الصنائع:644/1) وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ. (بدائع الصنائع:644/1)

অর্থ: ‘অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের বক্তব্যই সঠিক। কেননা হযরত উমর রা. রামাযান মাসে সাহাবায়ে কিরামকে উবাই ইবনে কা’ব রা.-এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা’ব রা. তাদেরকে নিয়ে প্রতিরাতে ২০ রাকা‘আতই পড়তেন। কোনো সাহাবী এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এটা তাদের ইজমাকে প্রমাণ করে।’ (বাদায়েউস সানায়ে: ১/৬৪৪, আরও দ্রষ্টব্য: বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ১/১৫২; মুগনী: ১/৮০৩, আওজাযুল মাসালিক: পৃ. ৩৯০; আত তা’লীকুল মুমাজ্জাদ: পৃ. নং ৫৩; শরহে নুক্বায়াহ: পৃ. নং ১০৪; আউনুল বারী: ২/৩০৭; আল আযকার: ৪/৪০১; ফাতহুল

ক্বাদীর: ১/৪০৭; আল বাহরুর রাইক্ব: ২/৬৬; বাদাইয়ুস সানায়ে': ১/২৮৮; শরহে মুনিয়া: পৃ. নং ৩৮৮; মারাকিল ফালাহ: পৃ. নং ৮১)

প্রসঙ্গক্রমে এটা সুস্পষ্ট যে, ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট তারাবীহের নামায মোট ৩৬ রাকা'আত হলেও তিনি ২০ রাকা'আতের কম তথা ৮ রাকা'আত না হওয়ার দিক দিয়ে সমস্ত ইমামের প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত্যের উপর রয়েছেন। তবে উক্ত মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় কিছু মুহাদ্দিস যথা, ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. প্রমুখ-এর মতে, ২০ রাকা'আতই শ্রেয়।

অতএব, উপরিউক্ত অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা তারাবীহের নামায ২০ রাকা'আত হওয়া; ৮ রাকা'আত না হওয়া সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো। কাজেই এ নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

(বিশ রাকা'আতের জন্য আরো দেখুন: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ৭৬৮৪, ৭৬৮৮, ৭৬৮৬, ৭৬৮৩, সুনানে বাইহাকী কুবরা হা. নং ৪৩৯৫, ৪৯০৩)

নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেবের কাণ্ড

ভারতবর্ষে তারাবীহ নামায ৮ রাকা'আত বিষয়ক বিদ'আত মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পর আরববিশ্বে শায়খ নসীব রেফায়ী নামে জনৈক আলেম সর্বপ্রথম এ বিদ'আতকে দালীলিক অবয়ব দেয়ার ব্যর্থ-চেষ্টা করেন। কিন্তু তৎকালীন আলেমগণ জোরালোভাবে তা খণ্ডন করে বই-পুস্তক রচনা করেন। এতে জনাব আলবানী সাহেবের আঁতে ঘা লেগে যাওয়ায় তিনি রেফায়ী সাহেবের সমর্থনে ১৩৭৭ হিজরীতে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি পাল্টা-জবাবমূলক পুস্তক রচনা করেন। বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইমামগণের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও বিদ্বেষের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রয়েছে। **এছাড়া বইটিতে উসূলে হাদীস, উসূলে ফিক্বাহ ও জারহ-তা'দীল বিষয়ে তার লজ্জাজনক দৈন্য ও অপরিপক্কতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।** এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুগণ তারাবীহ বিষয়ে কলুষিত এই বইটিকেই অন্ধের ন্যায় মাথায় তুলে রেখেছেন।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, শায়খ নসীব রেফায়ীর মতবাদের খণ্ডনে লিখিত সাড়া জাগানো কিতাব **الصابة فى الانتصار للخلفاء الراشدة** (আল ইসাবাহ ফিল ইনতিসার লিল খুলাফাইর রাশিদাহ)-এর ৬১নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লিখা হয়েছে:

"وَلَمْ يَشُذَّ أَحَدٌ مَنْهُمْ بِمَنْعِهَا غَيْرُ هٰذِهِ الشِّرْذِمَةِ الَّتِيْ ظَهَرَتْ فِيْ زَمَانِنَا كَالشَّيْخِ نَاصِرٍ وَ إِخْوَانِهِ."

অর্থ: "আমাদের এ যুগে গজিয়ে উঠা জনাব নাসিরুদ্দীন আলবানী ও তার সমমনা ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠি ব্যতীত কেউই ২০ রাকা'আত তারাবীহকে অস্বীকার করে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিপতিত হয়নি।"

আশ্চর্যজনক হলো: এর জবাবে আলবানী সাহেবের পক্ষে কোনো সাহাবী, তাবেঈ, ফক্বীহ ইমাম বা কোনো মুহাদ্দিস ইমামের উদ্ধৃতি তো দূরের কথা, তিনি কোনো মসজিদের সন্ধান দিতেও সক্ষম হননি; যেখানে তারাবীহের নামায আট রাকা'আত হতো। অনেক ঘাটাঘাটির পরও কোনো গত্যন্তর না পেয়ে অবশেষে তিনি জুরী নামক অজ্ঞাত এক ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে প্রকাশ্য দিবালোককে অস্বীকার করার ন্যায় ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বলে দিলেন যে, তিনি না-কি ২০ রাকা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী উক্ত জুরী ইমাম মালেক রহ.-এর অনেক পরবর্তী একজন লোক। তার কোনো পরিচয় কিংবা ইমাম মালেক রহ. পর্যন্ত তার কোনো সনদ, বা সংশ্লিষ্টতা কোনোকিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপরন্তু মালেকী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থ এবং তদীয় ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সংকলিত 'আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা'তে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:

'তারাবীহের নামায বিতরের তিন রাকা'আতসহ মোট ৩৯ রাকা'আত এবং তৎকালীন মদীনার গভর্নর রাকা'আত সংখ্যা কমাতে চাইলে তিনি তাকে বারণ করে দেন।' (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা: ১/১৯৩, আরও দ্রষ্টব্য: বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ১/২৪৬, আল ইসতিযকার: ৫/১৫৭, আল মুনতাকা: ১/২০৮)

*** বিশেষ দ্রষ্টব্য:** তারাবীহ নামাযের রাকা'আত সংখ্যা নিয়ে বর্তমান শতাব্দিতে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ. 'রাকা'আতে তারাবীহ' নামক বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণাধর্মী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটি ১৩৭৭ হিজরীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি সাহাবা-যুগ থেকে নিয়ে লা-মাযহাবী কর্তৃক ৮ রাকা'আতের বিদ'আত চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে বারোশত বছরের প্রতিটি শতাব্দির আ'মালে মুতাওয়ারাস তথা উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এক এক শতাব্দি ধরে ধরে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তারপর অর্ধ শতাব্দি অতিবাহিত হয়ে গেলেও লা-মাযহাবীদের কেউ অদ্যাবধি তা খণ্ডন করতে সক্ষম হয়নি এবং আদৌ তা সম্ভবও নয়।

লা-মাযহাবী বন্ধুগণ কর্তৃক দলীলের মোড়কে কিছু অলীক দাবি ও সেগুলোর অসারতা

(১) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা.-এর একটি বর্ণনা:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً...الخ(صحيح مسلم:254/1)

অর্থ: 'আবূ সালামাহ বলেন যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামায কেমন হতো? আয়িশা রা. উত্তরে বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে ও অন্যমাসে এগারো রাকা'আতের বেশি পড়তেন না।' (সহীহ মুসলিম: ১/২৫৪, হা. নং ৭৩৮০; সহীহ বুখারী হা. নং ২০১৩)

পর্যালোচনা: পাঠক-মাত্রই বুঝতে পারছেন, এটি তারাবীহ বিষয়ক কোনো হাদীস নয়। কারণ:

ক) তারাবীহ শুধু রামাযানে আদায় করা হয়, আর তাহাজ্জুদ সারা বৎসর পড়া হয়। আর হাদীসটি সারা বৎসরের আমলের বর্ণনা। অতএব, এটি হলো তাহাজ্জুদ ও বিতর-এর নামায (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস: ২/৩৩০)

খ) সাহাবাগণ আমলে-নববী ও হাদীসে-নববীর মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা কেউই এটিকে তারাবীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেননি।

গ) স্বয়ং রাবী হযরত আয়িশা রা. চার খলীফার কোনো এক খলীফার যুগেও তার এ হাদীসটিকে তারাবীহের ২০ রাকা'আতের সর্বসম্মত আমলের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে দাঁড় করাননি।

উপায়ান্তর না দেখে লা-মাযহাবী বন্ধুগণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হওয়ার দাবি করে বসলেন, যা সাময়িক হাসির খোরাক যোগানো ছাড়া আর কোনো কাজে আসলো না। তথাপি এখানে এদের দাবীর কিছু অসাড়তা তুলে ধরা হচ্ছে:

ক) শরী'আতের দলীল চতুষ্টয়ের কোনো একটি দ্বারাও তারা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক ও অভিন্ন প্রমাণ করতে পারেনি এবং পারবেও না।

খ) সমস্ত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় কায়েম করেছেন।

গ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় বলেছেন যে, একই নামাযের নাম এগারো মাসব্যাপী তাহাজ্জুদ, আর বারোতম মাসে সেটি তারাবীহ?

উল্লিখিত হাদীস-কেন্দ্রিক লা-মাযহাবী ভাইদের স্ববিরোধী কিছু কার্যকলাপ দেখুন:

ক) তারা এ হাদীসটি দ্বারা ৮ রাকা'আত তারাবীহ দাবি করলেও ঐ হাদীসেই উল্লিখিত তিন রাকা'আত বিতর গ্রহণ করতে নারাজ।

খ) হাদীসে সারা বৎসরের কথা বলা হলেও রামাযানের বাহিরে তাদের এ আমলটি দেখা যায় না।

ঘ) হাদীসে উক্ত আট রাকা'আত নামায ঘরে আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা এটি মসজিদে গিয়ে পড়েন।

ঙ) হাদীসে এ নামায জামা'আত ব্যতীত একাকী আদায় করার কথা থাকলেও তারা জামা'আতের সাথে পড়েন।

(২) দ্বিতীয় দলীল হিসেবে তারা হযরত জাবের রা.-এর সূত্রে একটি বর্ণনা পেশ করে থাকেন। আর সেটি হচ্ছে:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ. ..

অর্থ: 'রামাযানের একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে আট রাকা'আত এবং বিতর পড়লেন।' (কিয়ামুল লাইল মারওয়াযী: ১/২১৭)

পর্যালোচনা: (ক) হাদীসটির একজন রাবী হলেন ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তার বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে লিখেন:

وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ جِدًّا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَيَعْقُوبُ هَذَا هُوَ الْقُمِّيُّ وفيه تشيع، وَمِثْلُ هَذَا لاَ يُقْبَلُ تَفَرُّدُهُ بِهِ. (البداية والنهاية:375/8)

অর্থ: 'হাদীসটি চরম পর্যায়ের মুনকার এবং এর সনদ যঈফ। ইয়াকুব হলো শী'আ মতাদর্শের লোক, আর এ ধরনের বিষয়ে তার তাফাররুদ (নিঃসঙ্গতা) অগ্রহণযোগ্য।'

তারাবীহ সংক্রান্ত এ রিওয়ায়াতটিতেও তিনি মুতাফাররিদ। তার রিওয়ায়াতটি উম্মতের ইজমা পরিপন্থী।

(খ) আরেক রাবী ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যঈফ রাবী। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, 'সে কিছুই না', নাসাঈ ও আবূ দাউদ রহ. তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন, আল্লামা সাজী ও উকাইলী রহ. তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনে আদী বলেন, তার 'হাদীসগুলো অরক্ষিত'। (তাহযীবুল কামাল: ২২/৫৮৮)

অতএব, হাদীস বিশারদ ইমামগণের এসব উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যঈফ রাবী। ফলে তার সূত্রে বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়াতটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(গ) ইমাম ইবনে আদী রহ. উপরিউক্ত হাদীসটিকে 'গাইরে মাহফূয' সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী-এর ভাষায় 'গাইরে মাহফূয' খেতাবটি মুনকার বা বাতিল রিওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। মুনকার হচ্ছে যঈফ হাদীসেরই একটি প্রকার। তবে তা এতোই যঈফ যে, এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়। (দেখুন! তাহযীবুল কামাল: ১৪/৫৩৩-৫৩৪; আল কামিল {ইবনে আদী}: ৬/৪৩৬; আয যুয়াফাউল কাবীর {উকাইল}: ৩/৩৮৩; ইতহাফুল মাহারাহ বিআতরাফিল আশারাহ {ইবনে হাজার}: ৩/৩০৯)

ঘ) হাদীসটি সহীহ ধরে নিলে হযরত জাবের রা.ই সর্বপ্রথম ২০ রাকা'আতের বিপক্ষে হাদীসটি পেশ করতেন। অথচ তিনি এমনটি করেননি।

(৩) তারা তৃতীয় দলীল হিসেবে উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর সূত্র দিয়ে একটি বিকৃত বিবরণ পেশ করে থাকেন। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ:

عَنْ مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِىَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

হাদীসটি সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে তার দু'জন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। (মুআত্তা মালেক হা. নং ১৩৫) (এক) মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, (দুই) ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে আবার তার পাঁচজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। যথা: ইমাম মালেক, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কত্তান, আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে ইসহাক, আব্দুর রাযযাক। তবে এ পাঁচজনের বর্ণনা পাঁচ রকম। যাকে পরিভাষায় 'ইযতিরাব' বলা হয়। তাদের কেউ এগারো রাকা'আতের কথা, কেউ তেরো রাকা'আতের কথা, আবার কেউ একুশ রাকা'আতের কথা বর্ণনা করেছেন।

অপরদিকে, সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা.-এর অপর ছাত্র ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা থেকে এ হাদীসটি ইবনু আবী যিব ও মুহাম্মাদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন।

আর তারা দু'জনই বিশ রাকা'আতের কথা বর্ণনা করেছেন। বিশ রাকা'আত সম্বলিত তাদের রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ:

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً "

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ»

অর্থ: সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, আমরা উমর রা.-এর যুগে বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়তাম এবং আলাদাভাবে বিতর পড়তাম। (সুনানে বাইহাকী কুবরা হা. নং ৪৩৯৩, মা'রেফাতুস সুনান হা. নং ১৪৪৩)

ইবনে আবী যিব রহ.-এর রিওয়ায়াতটিকে ইমাম নববী, ইরাকী, সুয়ূতীসহ আরো অনেকে সহীহ বলেছেন। (তুহফাতুল আখইয়ার: পৃ. ১৯২, ইরাশাদুস সারী: ৩/২৩৪, তুহফাতুল আহওয়াযী: ২/৭৫)

আর মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের রিওয়ায়াতকে মোল্লা আলী ক্বারী রহ.শরহে মুআত্তাতে সহীহ বলেছেন (তুহফাতুল আহওয়াযী: ২/৭৫)

সুতরাং দেখা গেলো, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার দুই ছাত্র একই শব্দে হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা.-এর সূত্রে বিশ রাকা'আতের কথা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের পাঁচজন ছাত্র পাঁচ ধরনের রিওয়ায়াত করেছেন, যেগুলো উসূলে হাদীসের দৃষ্টিতে 'মুযতারাব' বলে গন্য হয়। আর মুযতারাব হাদীস কোনো ইমামের মতেই দলীলযোগ্য নয়। উপরন্তু, হাদীসটি সহীহ হলে স্বয়ং উবাই ইবনে কা'ব রা. ২০ রাকা'আত না পড়িয়ে ৮ রাকা'আত পড়াতেন।

(৪) একজন রাবী উমর রা.-এর যুগের তারাবীহের বর্ণনা দিতে গিয়ে ২০ এর স্থলে ভুলক্রমে ৮ বলে ফেলেছেন। আর এটিকেই লা-মাযহাবী বন্ধুগণ সানন্দে লুফে নিলেন। অথচ,

(ক) পূর্বোল্লিখিত বিপুল পরিমাণ সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইজমা ও ধারাবাহিক কর্মধারার আলোকে উমর রা.-এর যুগে এবং পরবর্তী খুলাফাদের যুগে তারাবীহের নামায ২০ রাকা'আত হওয়াটা সুপ্রমাণিত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

(খ) ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. ও আরো বেশকিছু মুহাক্কিক আলিম বলেছেন যে, ২০ এর স্থলে ৮ উল্লেখ করা বর্ণনাকারীর ভুল। (দেখুন: আল ইসতিযকার: ৫/১৫৬; রাকা'আতে তারাবীহ: পৃ. ১১-১২)

শেষকথা: "একটি সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা, দু'টি পরিত্যক্ত ও একটি বিভ্রান্ত বর্ণনা"-গোঁজামিল মার্কা এতোটুকুন পুঁজি নিয়ে বিপুল পরিমাণ নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত যুগের ইমামগণের ঐক্যমত্যে প্রতিষ্ঠিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা খেলনার পিস্তল নিয়ে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়ার নামান্তর। সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন কোনোলোক এটি কখনো কল্পনাও করতে পারেন না। তাই লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি, মুসলিম উম্মাহর এ দুর্দশার যুগে অনৈতিক পন্থায় অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডার বিষবাষ্প ছড়িয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে আর বিভ্রান্ত না করে শাশ্বত সত্যের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বাস্তব সত্য গ্রহণ করার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাযা নামায পড়ার বিধান

কুরআন ও সুন্নাহ-তে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনার পর নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেটা সময়মতো আদায় করা হোক, অথবা ওয়াক্তের পর কাযা করা হোক। বস্তুত শরী'আতে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান এবং নামায ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কেউ যদি কোনো কারণে সময়মতো নামায পড়তে না পারে তাহলে পরবর্তীতে তা কাযা করা জরুরি।

নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এ সম্পর্কিত দলীল উল্লেখ করা হলো:

(১) পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নিসার ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

'নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রতি নামায অপরিহার্য রয়েছে, যার সময়-সীমা নির্ধারিত'।

এ আয়াতে নামাযের সময়-সীমা নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি যেমন বলা হয়েছে, তেমনি নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা না হলে পরবর্তীতে উক্ত নামাযের কাযা আদায় করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার ঋণ, আর ঋণ সময়মতো আদায় না করতে পারলে পরবর্তীতে তা আদায় করা জরুরী। যেমন, সামনের হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক মহিলা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, আমার মা মান্নত করেছিলেন যে, তিনি হজ্জ করবেন। কিন্তু তা পুরা করার আগেই তিনি মারা যান। (এখন আমার করণীয় কী?) নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»

'তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করে নাও। বলতো, যদি তোমার মা কারো নিকট ঋণী হতেন তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে? মহিলা বললো, হ্যাঁ। তখন প্রত্যুত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, তবে তোমরা আল্লাহর ঋণকেও পরিশোধ করো। কেননা তিনি তাঁর প্রাপ্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। (সহীহ বুখারী: ১/২৪৯, হা. নং ১৮৫২; নাসাঈ: ২/২, হা. নং ২৬৪৩)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো, যে ইবাদাত বান্দার উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য, তা বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার পাওনা বা ঋণ। এ ঋণ থেকে

দায়মুক্তির পথ হলো, তা আদায় করা। যেমনিভাবে মানুষের পাওনা ঋণের নির্ধারিত সময় পার হওয়ার দ্বারা মানুষের ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি নির্ধারিত সময় পার হওয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ঋণ থেকেও দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আর শরী'আতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামাযের ক্ষেত্রে এ মূলনীতি যে পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে, জ্ঞানী-মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

(৩) একরাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে নিয়ে সফর করছিলেন। শেষরাতে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সফর বিরতি দিলেন। হযরত বিলাল রা.কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে হযরত বিলাল রা.-এর তন্দ্রা এসে গেলো। ফলে সবার ফজরের নামায কাযা হয়ে গেলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর সবাইকে নিয়ে ফজরের নামায কাযা করলেন। এ বিষয়টিই অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ঘুম বা বিস্মৃতির কারণে যার নামায ছুটে গেলো, যখন সে জাগ্রত হবে তখন যেনো সে তা আদায় করে নেয়। (বুখারী হা.নং ৫৯৭, মুসলিম হা.নং ৬৮১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সেই দুই রাকা'আত নামায যা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা হিসেবে আদায় করেছেন, আমার নিকট তা সমগ্র দুনিয়ার মালিকানা লাভ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। (মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮১, হা. নং ২৩৪৯; মুসনাদে আবী ইয়ালা: ৩/২২-২৩, হা. নং ২৩৭১)

(৪) খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরার দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে বনূ কুরাইযা অভিমুখে পাঠানোর সময় বললেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

'তোমাদের কেউ যেনো বনী কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামায না পড়ে'। (সহীহ বুখারী: ১/১২৯, হা.নং ৪১১৯, সহীহ মুসলিম: ২/৯৬, হা. নং ১৭৭০)

সাহাবায়ে কিরাম রা. রওনা হলেন। পথে আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হলে কতক সাহাবী পথেই সময়ের ভিতর আসর পড়ে নেন। আর কতক সাহাবী বনী কুরাইযায় পৌঁছার পর আসরের নামায কাযা পড়েন। নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা শুনলেন। কিন্তু পরে কাযা আদায়কারীগণকে একথা বলেননি যে, নামায শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়েই আদায়যোগ্য। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর কোনো কাযা নেই।

সুতরাং এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা গেলো যে, কোনো কারণবশত নামায ওয়াক্ত-মতো না পড়তে পারলে সেই নামায অবশ্যই কাযা পড়তে হবে। এ কারণে যারা কাযা পড়েছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকেও সমর্থন করেছিলেন।

(৫) খন্দকের যুদ্ধের সময় স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিলো। যুদ্ধের কারণে সময়মতো পড়া সম্ভব হয়নি। এ নামাযগুলি তিনি কাযা হিসেবে পড়ে নিয়েছিলেন। (বুখারী: ১/১৬২, ২/৩০৭, হা. নং ৪১১২)

(৬) এ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হলো, ইজমায়ে উম্মত। মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময়ের পরে তা কাযা করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে কাযা করা, বা ওযরবশত কাযা হয়ে যাওয়া উভয় প্রকারের বিধানই সমান।

যেমন, মালেকী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বিনা ওযরে অনাদায়কৃত নামায কাযা করা অপরিহার্য হওয়ার পক্ষে শরঈ প্রমাণাদি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تُصَلَّى وَتُقْضَى بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا كَالصَّائِمِ سَوَاءً وَإِنْ كَانَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ الَّذِينَ أُمِرَ مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَنْ سَبِيلِهِمْ يُغْنِي عن الدليل فِي ذَلِكَ (الاستذكار: 302/1)

ফরয রোযার মতো ফরয নামাযও সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কাযা করতে হয়। এ ব্যাপারে যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট দলীল, যার অনুসরণ করা

ঐসব বিচ্ছিন্ন মতের প্রবক্তাদের জন্যও অপরিহার্য ছিলো। তারপরও কিছু দলীল উল্লেখ করা হলো। যথা, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীসমূহ....(আলইসতিযকার: ১/৩০২-৩০৩)

হাদীসের প্রত্যেক কিতাবে ‘বাবু কাযাইল ফাওয়ায়েত’ তথা ‘ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার অধ্যায়’ নামে কাযা নামায পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কাযা নামায আদায় করা জরুরী হওয়ার বিষয়ে এটাও মজবুত প্রমাণ।

তাছাড়া, এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস ও সাহাবা কিরামের ফাতাওয়া রয়েছে। বেশি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় এখানে শুধুমাত্র একটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাযা নামায আদায় করা জরুরি। উম্মতের নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামও এ বিষয়ে একমত।

তারপরও আমাদের কিছু দীনী ভাই যারা নিজেদেরকে ‘আহলুল হাদীস’ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, তারা কাযা নামায আদায়ের বিধানকে সহীহ হাদীসের খেলাফ মনে করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে কিছু হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বিভ্রান্ত করে থাকেন। এ সম্পর্কে তারা যে-সব দলীল পেশ করে থাকেন সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ»

‘যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো’। (সহীহ ইবনে হিব্বান: হা. নং ১৪৬৩, খ. ৪, পৃ. ৩২৩)

আর অপর এক হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا

‘ইসলাম গ্রহণ করলে অতীত গুনাহসমূহ আল্লাহ তা‘আলা মাফ করে দেন। অনুরূপভাবে, হিজরত করলেও হিজরতের পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।’ (সহীহ মুসলিম হা. নং ১২১)

সুতরাং উল্লিখিত দুই হাদীসের আলোকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, নামায পরিত্যাগ করার কারণে মুসলমান কাফির হয়ে যায়। এখন পুনরায় মুসলমান হওয়া তার কর্তব্য। যখন সে পুনরায় মুসলমান হয়ে যাবে তখন তার কাযা নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ মুসলমান হওয়ার দ্বারা আগের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে আহলে হাদীস ভাইদের অভিমত।

অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ইমাম বা হাদীস ব্যাখ্যাকারী এ হাদীস দু’টির এরূপ ব্যাখ্যা করেন নি। একমাত্র আহলুল হাদীস ভাইয়েরাই এ ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লিখিত উভয় হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলো তার এ কাজটি কেমন যেনো কাফিরদের কাজের মতো হলো। কিন্তু লোকটি এর দ্বারা কাফির হবে না।

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা: কোনো অমুসলিম মুসলমান হলে আল্লাহ তা‘আলা মেহেরবানী করে তার অতীত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কোনো ইমাম এই অর্থ করেননি যে, কোনো মুসলমান নামায ত্যাগ করে কাফির হয়ে পুনরায় মুসলমান হলে তার পিছনের কাযা নামায পড়া লাগবে না। বরং পূর্বোল্লিখিত আয়াত, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, উমরী কাযা নামায আদায় করা তেমনি ফরযে আইন, যেমনটি সময়মতো আদায় করা ফরযে আইন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে উক্ত বিধানের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলীল

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি নাকি বারোটি-এ সম্পর্কে মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ রহ.-এর মতে, ঈদের নামাযে বারো তাকবীর দিতে হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা,

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে, উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

ছয় তাকবীরের দলীলের আলোচনার আগে জেনে নেয়া উচিত যে, তাকবীর সংক্রান্ত ইমামদের এ ইখতিলাফ শুধুমাত্র উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। অর্থাৎ, যারা বারো তাকবীরের কথা বলেন, তাদের মতে ছয় তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু বারো তাকবীর দেয়া উত্তম। তেমনিভাবে যারা ছয় তাকবীরের কথা বলেন, তাদের মতে বারো তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো, ছয় তাকবীর দেয়া। কেননা উভয় পদ্ধতি সাহাবাদের আমল থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত। তাই একটি মত গ্রহণ করলে অপরটিকে তুচ্ছজ্ঞান করা যাবে না। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন: 'সালফে সালেহীন-এর মধ্য থেকে প্রত্যেকেই শরী'আতসম্মত পদ্ধতিতে নামায, দু'আ, যিকির ইত্যাদি আদায় করেছেন। আর প্রত্যেক ইমামের ছাত্রগণ ও তার দেশবাসী উক্ত ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কখনো প্রত্যেক ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি (জায়িয ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে) এক মানের হয়, আবার কখনো কারো অনুসৃত পদ্ধতি অপরের পদ্ধতি থেকে উত্তম হয়ে থাকে ...। এমনক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, শরী'আত সমর্থিত দলীল ছাড়া একের মতকে অন্যের মতের উপর প্রাধান্য না দেয়া। হ্যাঁ, শরী'আতের দলীলের ভিত্তিতে যদি কোনো এক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করে তবে সেটার উপর আমল করা উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ অন্যকোনো জায়িয পদ্ধতির অনুসরণ করলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না।' (আদাবুল ইখতিলাফ: ১১৪ পৃ.)

উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে এই হলো ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মতামত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে মাননীয় ও বরণীয়। তা সত্ত্বেও তারা আজ নামায-সংক্রান্ত এমন সব উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের ইখতিলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, যেসব ইখতিলাফ শত শত বছর পূর্বে মিটে গেছে। এসব ইখতিলাফী মাসআলা নিয়ে তারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সরলপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ভারত উপমহাদেশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমানদের

আবাসস্থল। এ অঞ্চলের মুসলমানদের অন্তরে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করাই বোধ হয় বর্তমান আহলে হাদীস বন্ধুদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। লা-মাযহাবী বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রোপাগান্ডার শিকার একটি মাসআলা হলো, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের মাসআলা। আহলে হাদীস বন্ধুরা বলতে চায়, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো হাদীস নেই, অথচ বারো তাকবীরের পক্ষে অনেক হাদীস আছে। তাই ঈদের নামাযে বারো তাকবীরই দিতে হবে। ছয় তাকবীর দিলে নামায হবে না।

ইনশা-আল্লাহ, আমরা ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের যথার্থতা উল্লেখ করে বারো তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমুচিত জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো, যাতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমান ভাইদের আস্থা হানাফী মাযহাবের উপর অটুট থাকে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আর কোনো হানাফী ভাইকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

জেনে নেয়া আবশ্যক যে, হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরকে বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে। কোনো হাদীসে ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলা হয়েছে। আবার, কোনো হাদীসে দুই রাকা'আতে চারটি করে মোট আট তাকবীরের কথা এসেছে। কিন্তু কোনো ইমামই ঈদের নামাযে নয় বা আট তাকবীরের প্রবক্তা নন। তাহলে বোঝা গেলো, নয় বা আটের বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল হাদীস উল্লেখ করার আগে সেই ব্যাখ্যা জেনে নিলে সামনের কথা বোঝা সহজ হবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ঈদের নামাযের প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর হয় পাঁচটি। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকূর তাকবীরসহ তাকবীর হয় চারটি। অতএব ফলাফল দাঁড়ালো ৫+৪=৯। হাদীসে যেখানেই নয় তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নয়-এর ব্যাখ্যা এটাই। অর্থাৎ, দুই রাকা'আতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর আর দুই রাকা'আতের রুকূর দুই তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমার এক তাকবীরসহ মোট নয় তাকবীর। আর চার চার আট তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো, প্রথম রাকা'আতে রুকূর তাকবীর

বাদ দিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট তাকবীর চারটি। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে রুকূর তাকবীর ও অতিরিক্ত তিন তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। ফলাফল ৪+৪=৮। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসের যেখানেই দুই রাকা'আতে চারটি করে আট তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মূলত অতিরিক্ত ছয় তাকবীরই উদ্দেশ্য; বাকিগুলো অন্য তাকবীর। এবার আমরা সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উল্লেখ করছি :

1.عن القاسم ابى عبد الرحمن قال حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا , النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ , فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , وَأَرْبَعًا , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ , قَالَ: «لاَ تَنْسَوْا , كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ» فَهَذَا حَدِيثٌ , حَسَنُ الإِسْنَادِ.

অর্থ: 'প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবূ আব্দুর রহমান কাসিম রহ. বলেন, আমাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন, ভুলো না যেনো। তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করে বাকি চার অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মতো (ঈদের নামাযেও প্রতি রাকা'আতে চারটি করে তাকবীর) । ইমাম তহাবী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তহাবী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭১, হা. নং ৭১২৯)

2- عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ»، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ»، وَقَالَ أَبُو عائِشَةَ: «وأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ»سنن ابى داؤد

অর্থ: 'প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম মকহুল দামেস্কী বলেছেন, আমাকে আবূ হুরাইরা রা.-এর একজন সঙ্গী আবূ আয়িশা আল উমাবী জানিয়েছেন যে, (কূফার

আমীর) সাঈদ ইবনুল ‘আস, আবূ মূসা আশআরী ও হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.কে জিজ্ঞেস করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কয় তাকবীর দিতেন? আবূ মূসা রা. উত্তরে বললেন, একেক রাকা‘আতে জানাযার তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। হুযাইফা রা. আবূ মূসা রা.কে সমর্থন করে বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আবূ মূসা রা. আরো বললেন, আমি যখন বসরার আমীর ছিলাম, তখন আমি সেখানে এভাবে প্রতি রাকা‘আতে চার তাকবীর দিতাম। আবূ আয়িশা বলেন, সাঈদ ইবনুল ‘আসের এ প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। (সুনানে আবূ দাউদ: ১/১৬৩, হা. নং ১১৫৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪১৬, হা. নং ১৭৭৩৪। সনদের বিবেচনায় হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। হাদীসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানতে ‘আসারুস সুনান: ৩১৫ পৃ. টীকা দ্রষ্টব্য। আর চার তাকবীরের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা যে তিন তাকবীর, তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)

3. عَنْ كُرْدُوسٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى، وَالْفِطْرِ تِسْعًا تِسْعًا، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَيَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِرَةِ فَيَبْدَأُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ» رواه الطبرانى فى الكبير(9513)و قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات.

অর্থ: ‘বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত কুরদূস রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দিতেন (তিনটি অতিরিক্ত আর একটি তাহরীমার), তারপর ক্বিরা‘আত পড়তেন। অতঃপর এক তাকবীর বলে রুকূ করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাকা‘আতে দাঁড়িয়ে ক্বিরা‘আত পড়ে আবারো মোট চারটি তাকবীর দিতেন যার একটি দিয়ে রুকূ করতেন।’ (আল-মু’জামুল কাবীর, হা. নং ৯৫১৩) এ হাদীস সম্পর্কে হাফেজে হাদীস আল্লামা হাইছামী রহ. বলেন, হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

অতএব, হায়ছামী রহ.-এর উক্তি অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আর আল্লামা নিমাভী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু এতে কোনো সমস্যা নেই।

কারণ, হাসান ও সহীহ উভয় প্রকারের হাদীসই আমলের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের গ্রহণযোগ্য।

4. عن علقمة والاسود قالا: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا ــ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ــ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ»

অর্থ: ‘আলক্বামা ও আসওয়াদ রহ. বলেছেন, একদা ইবনে মাসঊদ, হুযাইফা ও আবূ মূসা আশআরী রা. বসেছিলেন। তখন সাঈদ ইবনুল ‘আস তাদের নিকট ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হুযাইফা রা. বললেন, আশআরী ভাইকে জিজ্ঞেস করো। আর আবূ মূসা আশআরী রা. বললেন, ইবনে মাসঊদ রা.কে জিজ্ঞেস করো, কেননা তিনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও বেশি ইলমের অধিকারী। সর্বশেষে সাঈদ ইবনুল ‘আস, ইবনে মাসঊদ রা.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দিবে (তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিনটি), তারপর ক্বিরা‘আত পড়ে তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা‘আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে ক্বিরা‘আত পড়বে, তারপর চারটি তাকবীর দেবে (অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি আর রুকূর একটি)। (মুহাল্লা বিল আসার: ৩/২৯৫, ইবনে হাযাম যাহেরী ও নিমাভী রহ. এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ৫৬৮৭, আসারুস সুনান : পৃ. ৩১৫)

5. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ هُوَ ابْنُ نَوْفَلٍ - قَالَ: كَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاَةِ (اخرجه ابن حزم الظاهرى فى المحلى بالاثار 3/295 دارالكتب . وقال فى سند هذا الاثر و الاثر الذى قبله: هذان اسنادان فى غاية الصحة.

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন নাওফেল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ঈদের দিন তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া প্রথম রাকা'আতে চারটি তাকবীর দেন (অতিরিক্ত তিনটি ও রুকূর একটি) । অতঃপর ক্বিরা'আত পড়েন, এরপর রুকূ করেন। দ্বিতীয় রাকা'আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে ক্বিরা'আত পড়লেন, এরপর নামাযের অন্যান্য তাকবীর ছাড়া অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর দিলেন।' ইবনে হাযাম রহ. এ হাদীস এবং এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'এই উভয় হাদীসের সনদ খুব সহীহ। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ হাদীস দ্বারাই দলীল দেন।' (মুহাল্লা বিল আসার: ৩/২৯৫)

6. اخرج ابن ابی شیبة حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا»

অর্থ: 'ইবনে আবী শাইবা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান থেকে, তিনি আশআছ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস রা. ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর দিতেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/৪৯৫, হা. নং ৫৭৬০, খ: ৪, পৃ. ২১৭)

এ আসারের রাবী ইবনে আবী শাইবা, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান এবং মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সকলেই সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। আর আশআছ সম্পর্কে ইমাম জামালুদ্দীন মিয্যী রহ. বলেন:

هواشعث بن عبد الملك, قال يحيى بن سعيد: هو عندى ثقة مامون, وقال ابن معين: اشعث ثقة وكذالك قال النسائى, وقال ابوحاتم: لابأس به.

অর্থ: 'তার পিতার নাম আব্দুল মালেক। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. তার সম্পর্কে বলেন, তিনি আমার মতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল। ইবনে মাঈন রহ. বলেন, আশআছ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, ইমাম নাসাঈও তার সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। আর ইমাম আবূ হাতেম রহ. বলেছেন, (হাদীসের ক্ষেত্রে) তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল: ২/২৭৯)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ হাদীসটিও সহীহ।

7- أخرج ابن أبي شيبة عن أَبِى أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالاَ: «تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ»

অর্থ: ‘হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. (তিনি তাবেঈদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলেন, ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর হবে। আর উভয় রাকা‘আতে ক্বিরা‘আত অবিচ্ছিন্ন ধারায় হবে। (অর্থাৎ উভয় রাকা‘আতের ক্বিরা‘আতের মাঝে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর হবে না।) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৪/২১৬, হা. নং ৫৭৫৬০)

এ হাদীসের রাবী সাঈদ ইবনে আবী আরুবা এবং ক্বাতাদাহ সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আর আবূ উসামা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন, ‘তিনি শীর্ষস্থানীয়দের একজন’। ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, ‘তিনি নির্ভরযোগ্য’। (সিয়ারু আ’লামিননুবালা: ৮/১৭৬) অতএব, এ হাদীসটির সনদও সহীহ।

8. عن عبد الله بن الحارث قال: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَبَّرَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ» قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا.

অর্থ: তাবেঈ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস বর্ণনা করেন যে, আমি বসরায় ইবনে আব্বাস রা.কে ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর দিতে দেখেছি এবং তিনি উভয় রাকা‘আতের ক্বিরা‘আত অবিচ্ছিন্নভাবে আদায় করেছেন। আর মুগীরা বিন শু’বাহ রা.কেও আমি এরূপ করতে দেখেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/২৯৪, হা. নং ৫৬৮৭; হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন, দেরায়া: ১/১১০)

উল্লেখ্য, এ উভয় হাদীসে নয় তাকবীরের মধ্যে ছয়টি অতিরিক্ত, আর তিনটি নামাযের স্বাভাবিক তাকবীর, যা শুরুতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর সম্পর্কে আরো কিছু আসার পাওয়া যায়। আলোচনা সংক্ষেপ-করণার্থে আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করলাম না। তবে যেসব

সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে ছয় তাকবীরের আমল সহীহ সনদে প্রমাণিত তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১.হযরত উমর রা. (শরহু মাআনিল আসার: ১/৩১৯)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.

৪. হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.

৫. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.

৭. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.

৮. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বাহ রা.

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/২৯১, হা. নং ৫৬৭৬)

১০. হযরত বারা ইবনে আযেব রা.

১১. হযরত হাজ্জাজ ইবনে মালেক রা.

১২. হযরত আবুত তুফায়েল আমের ইবনে ওয়াসেলা রা.

১৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা.

১৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.

১৫. হযরত আবূ রাফে রা.

১৬. হযরত আবূ উমাম আল বাহেলী রা.

বি.দ্র. ১০-১৬ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম রা. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা.-এর শাগরিদ। আর ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা.-এর শাগরিদগণ ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দিতেন।' (দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৪/২২০, হা. নং ৫৭৬১)

বিশিষ্ট যেসব তাবেঈ হযরত ছয় তাকবীরের উপর আমল করতেন:

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত, তাবেঈদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন:

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ.
২. আলক্বামা বিন কায়েস রহ.
৩. আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ রহ. (আততাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ: পৃ. ২৫৫)।
এ তিনজনই ছয় তাকবীরের উপর আমল করতেন
৪. ক্বাতাদাহ বিন দিআমা রহ.
৫. আবূ কিলাবা রহ.
৬. আবূ জা'ফর রহ. (দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৪/২১৭, হা. নং ৫৭৬২, ৫৭৬৩; শায়েখ আওয়ামার তাহকীক)। এরাও অনুরূপ আমল করেন।

মারফূ হাদীস, আসারে সাহাবা এবং আসারে তাবেঈন দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য সনদে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও যারা ছয় তাকবীর নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা মূলত মুসলিম সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে সাহায্য করছে। এছাড়া অন্যকোনো উদ্দেশ্য আমাদের বুঝে আসে না। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

বারো তাকবীরের পক্ষে লা-মাযহাবী বন্ধুরা যেসব হাদীস পেশ করে থাকেন সেগুলোর পর্যালোচনা:

1. عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.

অর্থ: কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ স্বীয় সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় ঈদের প্রথম রাকা'আতে ক্বিরা'আতের পূর্বে সাত তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ক্বিরা'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (সুনানে তিরমিযী: ১/১১১, হা. নং ৫৩৬)

আমাদের কথা: এ হাদীসটি কাসীর বিন আব্দুল্লাহ রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত। আমরা কাসীর বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমামদের মন্তব্য তুলে ধরছি। যাতে বোঝা যায় যে, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য কি-না?

ইমাম আহমাদ রহ. কাসীর সম্পর্কে বলেন, **منكر الحديث، ليس بشيء.** 'তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত, তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।' রিজাল শাস্ত্রের আরেক দিকপাল ইয়াইইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তানও তার সম্পর্কে **ليس بشيء.** বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম শাফিঈ কাসীর সম্পর্কে বলেছেন, **ذاك أحد الكذابين.** 'সে একজন মিথ্যুক।' ইমাম আবূ যুরআহ বলেছেন, **واهي الحديث، ليس بقوي.** 'সে মনগড়া হাদীস বয়ান করে, আর সে অতি-দুর্বল বর্ণনাকারী'। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী রহ. বলেছেন, **متروك الحديث.** 'তার হাদীস পরিত্যাজ্য।' (দেখুন তাহযীবুত তাহযীব: ৬/৫৫৮)

হাদীস বিশারদ ও রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমামগণের মন্তব্য দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কাসীর বিন আব্দুল্লাহ একজন অগ্রহণযোগ্য রাবী। তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস প্রমাণের উপযুক্ত নয়। অতএব, এ হাদীসটি বারো তাকবীর প্রমাণের উপযুক্ত নয়।

2.عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صَلَّى صَلَاةَ الْعِيْدِ فَكَبَّرَ فِيْ الأُوْلَى سَبْعًا وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ. (سنن البيهقي ٣/٤١٢)

অর্থ: হযরত উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি ঈদের নামায পড়ার সময় প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর দিলেন, আর দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর দিলেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠালেন। (সুনানে বাইহাকী: ৩/৪০৮, হা. নং ৬১৮২)

আমাদের কথা: হযরত উমর রা.-এর আমল সম্পর্কে বর্ণিত এ আসারের সনদে ইফরীকী নামক একজন রাবী রয়েছেন, যার মূল নাম আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম। এই ইফরীকী সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, **ضعف يحيى الإفريقي.** 'ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহ. ইফরীকীকে যঈফ বলেছেন।' আর আব্দুর রহমান বিন মাহদী ইফরীকী সম্পর্কে বলেছেন, **أما الإفريقي فما ينبغي**

أن يروى الحديث عنه. ‘আর ইফরীকী, সে তো এমন যে, তার থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করা উচিত নয়।’ ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেছেন, **ليس بشيء** ‘তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।’ ইমাম নাসাঈ তাকে ‘যঈফ’ বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব: ৫/৮৬) হাদীস শাস্ত্রের এসব বিদগ্ধ ইমামদের মন্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, ইফরীকী একজন ‘যঈফ’ রাবী। অতএব, তার সূত্রে বর্ণিত হযরত উমর রা.-এর আমল সম্পর্কীয় আসারটি দলীলযোগ্য হতে পারে না।

তাছাড়া, হযরত উমর রা. থেকে ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের উপর আমল সুপ্রমাণিত। ইমাম তহাবী রহ. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলো যে, জানাযার নামাযে তাকবীর সংখ্যা কতো হবে? চার, পাঁচ, নাকি সাতটি? এ মতভেদ নিরসনে হযরত উমর রা. নিজ খিলাফতকালে সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে বললেন, ‘আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। কোনোবিষয়ে আপনাদের মতৈক্য, বা মতানৈক্য পরবর্তীদের মধ্যে মতৈক্য, বা মতানৈক্য সৃষ্টি করবে। তার একথা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমীরুল মু’মিনীন আপনি ঠিক বলেছেন। আলোচিত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলুন। উমর রা. বললেন, বরং আপনারা আপনাদের মতামত বলুন। কেননা আমিও আপনাদের মতোই একজন মানুষ। এরপর সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর মতবিনিময় করলেন এবং এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় চার চার তাকবীর হয়ে থাকে, সেভাবে জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে। (শরহু মাআনিল আসার: ১/৩১৯)

বি.দ্র. উল্লেখ্য যে, ঈদ ও জানাযার তাকবীরের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন রকম আমল পাওয়া যায়। তবে এ কথা ঠিক যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ আমল ছিলো চার চার তাকবীর, যে চারটির তিনটি অতিরিক্ত হবে। এজন্যই এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়ে গেলেন।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা একথা বোঝা গেলো যে, ঈদের নামাযে প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ চার তাকবীর হওয়া একটি স্বীকৃত বিষয় ছিলো। যে কারণে জানাযার তাকবীরের সমাধান ঈদের তাকবীরের সাথে তুলনা করে করা হলো। এ ঘটনা দ্বারা একথাও বুঝে আসে যে, হযরত উমর রা.সহ ঐ মাজলিসে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কিরামই দুই ঈদে ছয় তাকবীরের প্রবক্তা ছিলেন।

অতএব, হযরত উমর রা. থেকে বারো তাকবীর বিষয়ক বর্ণিত আসার সম্পর্কে আমরা একথা বলতে পারি যে, দুই কারণে উক্ত আসার গ্রহণযোগ্য নয়। (১) এ আসারের রাবী ইফরীকী যঈফ, এবং (২) হযরত উমর রা. থেকে দুই ঈদে ছয় তাকবীর প্রমাণিত।

3. عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا، وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ".

অর্থ: হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে ক্বিরা'আতের পূর্বে সাতটি ও পাঁচটি করে তাকবীর দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪২২, হা. নং. ২৪৩৬২)

4.عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»

অর্থ: হযরত 'আমর ইবনুল 'আস রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর, আর দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর। উভয় রাকা'আতে তাকবীরের পরেই ক্বিরা'আত। (সুনানে আবূ দাউদ: ১/১৬৩, হা. নং ১১৫১)

৩ ও ৪ নং হাদীস সম্পর্কে আমাদের কথা: গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের অনুসৃত ইমাম ইবনে হাযাম রহ. স্বীয় কিতাব মুহাল্লা বিল আসার-এ হযরত আয়িশা রা. ও 'আমর ইবনুল 'আস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দুটি উল্লেখ করার পর বলেন,

وهذا كله لا يصح.‘এ দু’টির একটিও সহীহ নয়’। (দেখুন, মুহাল্লা বিল আসার: ৩/২৯৬)

তাছাড়া, হযরত আয়িশা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে বুখারী রহ.ও যঈফ আখ্যা দিয়েছেন । (প্রাগুক্ত টীকা দ্রষ্টব্য।) আর ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম মনিশাপুরী রহ. এ উভয় হাদীসের সনদকে ‘ফাসেদ’ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ. তা সমর্থন করেছেন। (দেখুন, আল মুস্তাদরাক: ১/২৯৮, হা. নং ২০৬)

5.عن نافع أنه قال: شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (1) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

অর্থ: নাফে রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা রা.-এর সাথে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা পড়েছি। তিনি প্রথম রাকা‘আতে ক্বিরা‘আতের পূর্বে সাত তাকবীর দিলেন, আর দ্বিতীয় রাকা‘আতে ক্বিরা‘আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক: ১/২৩৯)

আমাদের কথা: আবূ হুরাইরা রা.-এর আমল সম্পর্কীয় এ আসারটির সনদ সহীহ। এই একটিমাত্র আসার ছাড়া বারো তাকবীর সম্পর্কীয় অন্যসব মারফূ এবং গাইরে মারফূ হাদীস যঈফ তথা প্রমাণযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ রহ. বারো তাকবীরের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন,

لَيْسَ يُرْوٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ تَكْبِيْرِ الْعِيْدَيْنِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

অর্থ: ‘ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সহীহ মারফূ হাদীস নেই।’ (নসবুর রায়াহ: ৩/২৮৯। উল্লেখ্য, ছয় তাকবীরের পক্ষে উল্লিখিত মারফূ হাদীসগুলো হাসান পর্যায়ের। অতএব, ইমাম আহমাদ রহ.-এর একথা দ্বারা আমাদের দলীল খণ্ডন হয় না।)

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বোঝার রয়েছে, যথা:

(ক) আবূ হুরাইরা রা.-এর আমলটি স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা ও হুকুমের খেলাফ (আমাদের দলীলের ১ম হাদীস দেখুন) । আর নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হুকুমের বরখেলাফ

কোনো সাহাবীর আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, হতে পারে ঐ বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুকুম তিনি জানতে পারেননি। এমন অনেক ঘটনা হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

(খ) অথবা, কোনো এক যামানায় নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারো তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা তরক করে ছয় তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়েছেন। আর এ খবর হযরত আবূ হুরাইরা রা.-এর নিকট পৌঁছেনি। তাই তিনি প্রথম যুগের বারো তাকবীরের উপর আমল করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বশেষ আমল জানা থাকলে কখনো তিনি তার খেলাফ করতেন না।

(গ) আবূ হুরাইরা রা.-এর আমলটি বড় বড় সাহাবায়ে কিরামের আমলের খেলাফ। এমতাবস্থায় বড় বড় সাহাবার আমল বাদ দিয়ে শুধু তার একার আমল গ্রহণ করা উচিত হবে না।

(ঘ) সর্বোপরি, এই তাকবীরগুলো নামাযের মূল অংশ নয়, বরং অতিরিক্ত অংশ। আর শরী‘আতের নীতি হলো, অতিরিক্ত বিষয় নামাযে দাখিল করতে হলে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

যা-হোক, ছয় ও বারো তাকবীরের ইখতিলাফের মধ্যে ছয় তাকবীর নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত। যারা বারো তাকবীরের কথা বলেন, তারাও ছয় তাকবীরকে মানেন। কেননা, বারোর মধ্যে ছয় আছে। কিন্তু বারো তাকবীরের বিষয়টি এমন নয়। কারণ, বারো তাকবীরকে সকলে স্বীকার করে না। বরং ছয় তাকবীরের প্রবক্তাগণ প্রকারান্তরে বারো তাকবীরকে অস্বীকার করেন। অতএব, অনিশ্চিত বিষয়কে নামাযের মধ্যে দাখিল করা উচিত হবে না। তাই আমরা একথা বলতে পারি যে, হানাফীদের আমল সকল দিক বিবেচনায় মজবুত এবং সহীহ।

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান

লা-মাযহাবী বন্ধুরা আজকাল বলে বেড়াচ্ছে যে, ‘জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরি। সূরা ফাতিহা না পড়লে জানাযার নামায শুদ্ধ হবে না। যারা

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তাদের জানাযার নামায সহীহ হবে না।' তাদের এসব কথা শুনে সরলমনা হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে, সংশয়ে নিপতিত হচ্ছে। তাই তাদের সংশয় দূর করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। আমরা এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হাদীস, আসারে সাহাবা, আসারে তাবেঈ এবং ফিক্বহী উদ্ধৃতি দিয়ে একথা প্রমাণ করে দেখাবো যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সূরা ফাতিহা না পড়লেও জানাযার নামায সহীহ হবে, যেমনটি হানাফী মাযহাবের বিধান।

নিম্নে ফিক্বহের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-হিদায়াহ'-এর বরাতে হানাফী মাযহাব অনুসারে জানাযা নামাযের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

قال صاحب الهداية: والصلاة ان يكبر تكبيرة يحمدالله عقيبها ثم يكبر تكبيرة يصلى فيها على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت و للمسلمين ثم يكبر الرابعة ويسلم. الهداية كتاب الجنائز فصل فى الصلاة على الميت.

হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামায নিম্নরূপ:
'প্রথমে একটি তাকবীর দিবে, তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও সানা পড়বে, এরপর আরেকটি তাকবীর দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়বে। অতঃপর আরেকটি তাকবীর দিয়ে নিজের জন্য, মৃত ব্যক্তির জন্য ও অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দু'আ করবে।' (আল-হিদায়াহ জানাযা অধ্যায়।)

হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

لايقرأ الفاتحة الا ان يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح القدير 2/85 رشيدية كتب خانة

অর্থ: 'জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জানাযায় ক্বিরা'আত পড়া প্রমাণিত নয়। তবে হামদ ও সানার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়া যেতে পারে।' (ফাতহুল ক্বাদীর: ২/৮৫)

ইমাম মালেক রহ.-এর মতেও জানাযার নামাযে ফাতিহা পড়তে হয় না। এ সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুদাও ওয়ানাতুল কুবরা'র বক্তব্য নিম্নরূপ:

قلت لعبد الرحمن بن القاسم: اى شيئ يقال على الميت فى قول مالك؟ قال: الدعاء للميت, قلت: فهل يقرأ على الجنازة فى قول مالك؟ قال: لا.

অর্থ: 'ইমাম সাহনূন বিন সাঈদ রহ. বলেন, আমি আমার উস্তাদ আব্দুর রহমান বিন কাসেমকে জিজ্ঞাসা করলাম, মালেক রহ.-এর মতানুযায়ী জানাযার নামাযে কী পড়তে হয়? তিনি বললেন, জানাযার নামাযে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ করতে হয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, জানাযার নামাযে কুরআন পড়া যাবে কি? তিনি বললেন, না।' (আল-মুদাও ওয়ানাতুল কুবরা: ১/২৫১)

জানাযার নামাযে ফাতিহা না পড়া সম্পর্কিত দলীল

প্রথম দলীল: হযরত আবূ হুরাইরা রা.-এর হাদীস:

اخرج مالك فى الموطا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتْبَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ...(الموطا لمالك برقم:258 , قال فى اعلاء السنن : ورجاله رجال الجماعة الا ان سعيدا تغير موته باربع سنين, الى ان قال: ان مثل مالك لايروى عنه فى التغير. اعلاء السنن 5/255)

অর্থ: 'হযরত সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ আল-মাকবুরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবূ হুরাইরা রা. (মৃ. ৫৭হি.)কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কীভাবে জানাযা পড়েন? আবূ হুরাইরা রা. বললেন, আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমি মাইয়্যিতের সাথে-সাথে আসি, এরপর যখন খাটিয়া রাখা হয় তখন (জানাযার নামাযের) তাকবীর দিয়ে হামদ-ছানা ও দুরূদ পড়ি, এরপর এই দু'আ পড়ি **اللهم انه عبدك ابن عبدك...** ।' (মুআত্তা মালেক হা.নং ২৫৮)

দ্বিতীয় দলীল: হযরত আবূ হুরাইরা রা.-এর আরেকটি বর্ণনা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»

قال صاحب اعلاء السنن: رواه ابوداؤد و صححه ابن حبان كذا فى بلوغ المرام. وقال ايضا: فى سند ابى داؤد محمد ابن اسحاق وقد عنعنه, ولكن قال فى التلخيص الحبير : لكن اخرجه ابن حبان من طريق اخرى عنه مصرحا بالسماع. اعلاء السنن 5/268 اشرفية بك (قال راقم الحروف: فالحديث حسن على الاقل)

অর্থ: 'আবূ হুরাইরা রা.থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযা পড়ো তখন তার জন্য ইখলাসের সাথে দু'আ করো।' (সুনানে আবূ দাঊদ হা.নং ৩১৯৯)

এ হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতের জন্য দু'আ করতে বলেছেন, ক্বিরা'আত পড়তে বলেননি। তাই জানাযার নামাযে কোনো ক্বিরা'আত পড়া যাবে না।

তৃতীয় দলীল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর আমল:

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ»

অর্থ: 'বিশিষ্ট তাবেঈ নাফে রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে উমর রা. জানাযার নামাযে ক্বিরা'আত পড়তেন না।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২২, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা-এর তাহকীক।)

চতুর্থ দলীল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. (মৃত্যু: ৩২হি.)-এর বর্ণনা:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ هَلْ يُقْرَأُ فِيْهَا؟ فَقَالَ لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْهَا قَوْلاً وَ لاَ قِرَاءَةً. وَ فِيْ رِوَايَةٍ دُعَاءً وَ لاَ قِرَاءَةً...

অর্থ: 'ইবনে মাসঊদ রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো, জানাযায় কোনো ক্বিরা'আত পড়তে হবে কি-না? তিনি বললেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযায় পড়ার জন্য কোনো কথা বা ক্বিরা'আত নির্ধারণ করে দেননি। আরেক

বর্ণনায় আছে, কোনো দু'আ বা ক্বিরা'আত নির্ধারণ করে দেননি। (উমদাতুল ক্বারী: ৬/১৯৪)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তে বলে যাননি। কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযায় যদি সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব করে দিতেন, তাহলে ইবনে মাসউদ রা. তা অবশ্যই জানতেন। কারণ তিনি সফরে-হযরে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাথে থাকতেন।

পঞ্চম দলীল: হযরত ফুযালা বিন উবাইদ রা. (মৃত্যু: ৫৩হি.) -এর বর্ণনা:

عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا»

অর্থ: 'মূসা বিন উলাই তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, আমি ফুযালা বিন উবাইদ রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, জানাযার নামাযে কোনো ক্বিরা'আত পড়তে হবে কি? তিনি বললেন, না। কোনো ক্বিরা'আত পড়তে হবে না।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৫)

ষষ্ঠ দলীল: উল্লিখিত সাহাবা কিরাম রা. ছাড়াও আরো কয়েকজন বড় বড় সাহাবা রা. জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেছেন। ইমাম সাহনূন বিন সাঈদ মালেকী আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন:

قال ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن عمر بن الخطاب و على بن ابى طالب و عبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد و ابى هريرة و جابربن عبد الله و واثلة بن الاسقع... انهم لم يكونوا يقرءون فى الصلاة على الميت.

অর্থ: 'ইবনে ওয়াহাব রা. সাহাবা কিরামের মধ্য থেকে বড় মাপের আলেম সাহাবীগণ যেমন: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত ফুযালা বিন উবাইদ, হযরত আবূ হুরাইরা, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হযরত ওয়াসেলা বিন আসক' প্রমুখ

সাহাবা কিরাম রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা জানাযার নামাযে ক্বিরা'আত পড়তেন না।' (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা: ১/২৫১, দারুল বায)

যে-সকল তাবেঈ ইমামগণ জানাযায় ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেছেন

১. বিশিষ্ট তাবেঈ আমের আশশা'বী রহ. (মৃত্যু: ১০৩ হি.)

عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «التَّكْبِيرَةُ الأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ»

অর্থ: 'আবূ হাশেম ইমাম শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম শা'বী বলেছেন, জানাযার প্রথম তাকবীর আল্লাহ তা'আলার ছানা পড়ার জন্য। দ্বিতীয় তাকবীর নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়ার জন্য। তৃতীয় তাকবীর মাইয়্যিতের উদ্দেশ্যে দু'আ করার জন্য। চতুর্থ তাকবীর সালাম ফিরানোর জন্য।' (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.নং ৬৪৩৫)

২. হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. (মৃত্যু: ৯৬হি.)

عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»

অর্থ: 'হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান বর্ণনা করেন, আমি ইবরাহীম নাখয়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, জানাযার নামাযে ক্বিরা'আত পড়তে হবে কি না? তিনি বললেন, না পড়তে হবে না। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.নং ৬৪৩৩)

৩. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. (মৃত্যু: ৯৪হি.)

عن قتادة عن ابن المسيب قال: مَانَعْلَمُ فِيْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلَادُعَاءٍ شَيْئًا مَعْلُوْمًا.

অর্থ: 'ক্বাতাদাহ রহ. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জানাযার নামাযে কোনো নির্দিষ্ট ক্বিরা'আত, কিংবা দু'আর কথা আমার জানা নেই।' (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.নং ৬৪৩৬)

৪. হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. (মৃত্যু: ১১০হি.)-এর আমল।

عن ايوب عن محمد أَنَّهُ كَانَ لَايَقْرَأُ فِيْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

অর্থ: ‘বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আইয়ূব সাখতিয়ানী রহ. মুহাম্মাদ বিন সীরীন সম্পর্কে বলেন, তিনি জানাযার নামাযে কোনো ক্বিরা‘আত পড়তেন না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৩)

৫. হযরত আবূল আলিয়াহ রহ. (মৃত্যু: ৯৩হি.)-এর ফাতাওয়া।

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلاَّ فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ».

অর্থ: ‘আবূল মিনহাল বলেন, আমি আবূল আলিয়াকে জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার মতে ফাতিহা এমন নামাযেই পড়তে হয়, যে নামাযে রুকূ-সিজদা আছে।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৪)

৬. হযরত আবূ বুরদাহ রহ. (মৃত্যু: ১৪০-১৫০হি.)-এর ফাতাওয়া।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «لاَ تَقْرَأْ».

অর্থ: ‘সাঈদ ইবনে আবূ বুরদাহ তার পিতা আবূ বুরদাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি তার পিতা আবূ বুরদাহকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বো? তিনি বললেন, না। তুমি পড়বে না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৬)

৭. নিজ যুগে মক্কাবাসীর ইমাম আত্বা ইবনে আবী রাবাহ রহ. (মৃত্যু: ১১৪হি.)-এর ফাতাওয়া।

عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا»

অর্থ: ‘হাজ্জাজ রহ. বর্ণনা করেন, আমি আত্বা ইবনে আবী রাবাহকে জানাযায় ক্বিরা‘আত পড়তে হবে কিনা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (পড়বে না) পড়ার কথা নতুন শুনছি।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৮)

৮. হযরত ত্বাঊস বিন কাইসান রহ. (মৃত্যু: ১০৬হি.)-এর আমল।

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا «يُنْكِرَانِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ»

অর্থ: ‘ত্বাঊস বিন কাইসান রহ.-এর পুত্র তার সম্পর্কে এবং আত্বা রহ.-এর সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ে জানাযার নামাযে ক্বিরা‘আত পড়তে অপছন্দ করতেন।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৯)

৯. হযরত বকর বিন আব্দুল্লাহ রহ. (মৃত্যু: ১০৮হি.)-এর বর্ণনা।

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لاَ أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً»

অর্থ: ‘ইসহাক বিন সুআইদ, বকর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জানাযায় ক্বিরা‘আত পড়ার কোনো হুকুম আমার জানা নেই।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫৩০)

১০. সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রহ. (মৃত্যু: ১০৬হি.)-এর ফাতাওয়া।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، فَقُلْتُ:: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ»

অর্থ: ‘মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহ বলেন, আমি সালেম রহ.কে জানাযায় ক্বিরা‘আতের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জানাযায় কোনো ক্বিরা‘আত পড়তে হয় না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫৩২)

উপরে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উদ্ধৃতিতে তাবেঈ ইমামগণের যে-সব উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সবকটির সনদই জিয়াদ তথা গ্রহণযোগ্য। হাফেযে হাদীস ইবনে আব্দুল বার রহ. তাবেঈ ইমামগণ থেকে বর্ণিত সবকটি উক্তির সনদকে জিয়াদ বলেছেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন ‘আল-ইস্তিযকার: ৩/৪২, তবআতু মক্কাতিল মুকাররমাহ’।)

উল্লিখিত তাবেঈগণ ছাড়াও আরো কয়েকজন তাবেঈ জানাযার নামাযে ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন: হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (মৃত্যু: ৯৩হি.), হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (মৃত্যু: ১০২হি.), হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান

(মৃত্যু: ১২০হি.), সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু: ১৬১হি.) প্রমুখ। (উমদাতুল কারী: ৬/১৯১, যাকারিয়া বুক ডিপো)

মদীনাবাসীর আমল: মদীনার বাসিন্দা ইমাম মালেক রহ. বলেন,

ليس ذالك بمعمول به ببلدنا انما هو الدعاء ادركت اهل بلد نا على ذالك.

অর্থ: 'আমাদের দেশে জানাযার নামাযে ক্বিরা'আত পড়ার উপর আমল নেই। জানাযায় শুধু দু'আ পড়া হয়। আমি আমার দেশবাসীকে এর উপরই আমল করতে দেখেছি।' (আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা: ১/২৫১)

আহলে হাদীস বন্ধুদের অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

جمهور السلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يقرءون الفاتحة.

অর্থ: 'অধিকাংশ সালাফ জানাযার নামাযে শুধু দু'আ পড়তেন, সূরা ফাতিহা পড়তেন না।' (ফয়যুল বারী: ৩/৩০২, কুয়েতের ছাপা)

শেষ কথা: হাদীস, ফিক্বহে হানাফী, আসারে সাহাবা, আসারে তাবেঈন, মদীনাবাসীর আমল ও ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর উক্তির মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান নেই। অতএব, যারা একথা বলে বেড়ায় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া জানাযার নামায হবে না, তাদের কথা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, সূরা ফাতিহা পড়ার কথাও যেহেতু হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় (যদিও ঐ হাদীসগুলো যথার্থ কারণে হানাফী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়), তাই কেউ যদি জানাযার নামাযে ছানা বা দু'আর স্থানে ছানা বা দু'আর নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ে তাহলে হানাফী মাযহাব অনুসারে কোনো সমস্যা নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১৬৪, বাহরুর রায়েক : ২/৩১৫ এর টীকা)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন

নর-নারীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদাগত দিক দিয়ে যদিও কোনো পার্থক্য করেননি কিন্তু শারীরিক গঠন, অবয়ব ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে আল্লাহ

তা‘আলা তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আর তাই শরী‘আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আযান-ইক্বামাত, নামাযের ইমামতি, ইহরাম-পরবর্তী সেলাই-বিহীন ও সেলাইকৃত কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার হুকুমের পার্থক্য একেবারেই স্পষ্ট। নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানা থেকে আজ অবধি উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা থেকে একথা সুপ্রমাণিত যে, পুরুষ-মহিলার নামাযের মধ্যে বিশেষ কিছু স্থানে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের বিষয়টি সবাই মেনে নিলেও আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা মানতে পারেনি। তাদের উদ্দেশ্যেই আমাদের এ প্রয়াস।

ان المرأة عورة ‘মহিলা (মূল্যবান হওয়ায়) গোপন করে রাখার মতো সৃষ্টি’। (আল-মু’জামুল কাবীর তবারানী : ৯/২৯৫, হা. নং. ৯৪৮০) যে জিনিস যতো মূল্যবান হয়, সে জিনিস ততো গোপন করে রাখা হয়। ইসলাম মহিলা জাতিকে অতি-মূল্যবান ও সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছে। সেজন্য তাকে গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলা হয়েছে। কারণ, মূল্যবান বস্তু যদি ঢেকে রাখা না হয়, গোপন করা না হয়, আবৃত করা না হয়, তাহলে তা লুট-ছিনতাই হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। মহিলা ‘গোপন বস্তু’ এ মূলনীতির আলোকেই মূলত শরী‘আতে বিভিন্ন হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

সেই পরিকল্পনায়ই পুরুষ-মহিলার নামাযের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন পার্থক্যের এ বিষয়টি খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত মহিলাদের নামাযের পার্থক্য অকপটে মেনে নিয়েছেন। ইমাম চতুষ্টয়ও এই পার্থক্যের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। বাইহাকী রহ. বিষয়টি সুনানে কুবরায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, নামাযের বিভিন্ন বিধানে পুরুষ-মহিলার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ভিন্নতার বিষয়ে প্রধান বিবেচ্য হলো ‘সতর’। অর্থাৎ, মহিলাদের জন্য শরী‘আতের হুকুম হলো, এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তাদেরকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। (সুনানে কুবরা বাইহাকী: ২/৩১৫, হা. নং ৩১৯৯)

মহিলাদের নামাযে পুরুষ থেকে পাঁচ-ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যথা:

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

২. হাত বাঁধার স্থান।

৩. রুকূতে ঝুঁকার ক্ষেত্রে।

৪. সিজদা করার ক্ষেত্রে।

৫. বৈঠকে।

প্রথম পার্থক্য: তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

1. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فساق الحديث. وفيه: «يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ، إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا»

رواه الطبرانى فى الكبير:22/19-20 قال الهيثمى فى مجمع الزوائد:272/2: رواه الطبرانى فى حديث طويل فى مناقب وائل من طريق مينونة عن عمتها ام يحيى بنت عبد الجبار, و لم اعرفها. وبقية رجاله ثقات.

অর্থ: ওয়াইল ইবনে হুজুর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে ওয়াইল ইবনে হুজুর! যখন তুমি নামায পড়বে তখন তুমি তোমার হাত কান পর্যন্ত উঠাবে, আর মহিলারা তাদের হাত বুকের উপর বাঁধবে।

হাইসামী রহ. বলেন, ‘এ হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য, উম্মে ইয়াহইয়া ব্যতীত’। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট উম্মে ইয়াহইয়াও প্রসিদ্ধ।

2. عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا»

المصنف لابن ابى شيبة:270/1

অর্থ: ইমাম যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবেন আবী শাইবা: ১/২৩৯, হা. নং ২৪৭০)

দ্বিতীয় পার্থক্য: হাত বাঁধার স্থান।

عن الطحاوى: الْمَرْأَةَ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى عَلَى صَدْرِهَا لأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا.

ইমাম তহাবী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা তাদের উভয় হাতকে বুকের উপর রেখে দিবে, আর এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর। (আসসিআয়া: ২/১৫৬, ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৫০৪, আল মাবসূত সারাখসী: ১/২৫)

তৃতীয় পার্থক্য: মহিলারা রুকূতে কম ঝুঁকবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهِ, وَتَجْمَعَ مَا اسْتَطَاعَتْ, فَإِذَا يَدَيْهَاإِلَيْهَا, وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا, وَتَجْمَعَ مَا اسْتَطَاعَتْ مصنف عبد الرزاق:صـــ6950

অর্থ: ‘যখন মহিলারা রুকূতে যাবে তখন হাতদ্বয় পেটের দিকে উঠিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে, আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয় শরীরের সাথে এবং পেট ও সীনাকে রানের সাথে মিলিয়ে দিবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।’ (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৩/১৩৭, হা. নং ৫০৬৯)

চতুর্থ পার্থক্য: মহিলারা সিজদা জড়সড় হয়ে করবে।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»كتاب المراسيل لابى داؤد برقم:80

অর্থ: ‘বিখ্যাত তাবেঈ ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিশিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়’। (কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবূ দাউদ হা.নং ৮০)

আবূ দাউদ রহ.-এর উক্ত হাদীস সম্পর্কে গাইরে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ‘আউনুল বারী’: ১/৫২০-এ লিখেছেন,

এই মুরসাল হাদীসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলীল হওয়ার যোগ্য।

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ ".

المصنف لابن ابی شیبة:303/1

অর্থ: হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর রহ. পুরুষদের জন্য মহিলাদের মতো উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবেন আবী শাইবা: ১/২৭০, হা. নং ২৭৮০)

عن الحسن وقتادة قالا: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ وَلَا تُجَافِي لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا، المصنف لابن ابی شیبة:303/1

অর্থ: হযরত হাসান বসরী ও ক্বাতাদাহ রহ. বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা করবে না, যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/২৭০, হা. নং ২৭৮০)

পঞ্চম পার্থক্য: বৈঠকের সময় মহিলাগণ উভয় পা ডানপাশ দিয়ে বের করে দিয়ে যমীনের উপর নিতম্ব রেখে উরুর সাথে পেট মিলিয়ে রাখবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْأُخْرَى، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا البیهقی فی السنن الکبری:223/2

অর্থ: ‘হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেনো এক উরু (ডান উরু) আরেক উরুর উপর রাখে। আর যখন সিজদা করবে তখন যেনো পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তাদের সতর ঢাকার জন্য অধিক উপযোগী হয়। (সুনানে কুবরা বাইহাকী: ২/৩১৫, হা. নং ৩১৯৯)

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، قَالَ: «كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ، وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ، يُتَّقَى ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيْءُ». المصيف لابن ابی شيبة:303/1

অর্থ: ‘হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রহ. বলেন যে, মহিলাদেরকে আদেশ করা হতো তারা যেনো নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে, পুরুষদের মতো না বসে। আবরণীয় কোনোকিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/২৭০, হা. নং ২৭৮০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «تَحْتَمِعُ وَتَحْتَفِرُ». المصنف لابن ابی شيبة:302/1

অর্থ: ‘ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, মহিলারা কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, ‘খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে’। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/২৭০, হা. নং ২৭৭৫)

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে একজন ঠান্ডা মস্তিষ্কের পাঠক সহজে অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে, মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের বিষয়টি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং এর পক্ষে অনেক শক্তিশালী দলীল রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ (?) সালাফ থেকে চলে আসা সুপ্রতিষ্ঠিত মত ও পথকে উপেক্ষা করে নিজেদের গবেষণালব্ধ মত ও পথকে জনগণের মাঝে চালিয়ে দেয়ার ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো:

আরবের প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদশায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার ‘সিফাতুস সালাত’ নামক গ্রন্থে দাবি করেন যে, পুরুষ-মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। তার এ দাবি হাদীস বিরোধী নয়, একথা প্রমাণ করার জন্য প্রথম পর্যায়ে তিনি আহলে হক্বের পক্ষের মহিলাদের নামাযের পার্থক্য-সম্বলিত মারাসীলে আবূ দাউদের হাদীসটিকে এ কথা বলে যঈফ আখ্যা দিলেন যে,

‘হাদীসটি মুরসাল, অতএব তা যঈফ’। অথচ অধিকাংশ ইমাম বিশেষ করে স্বর্ণযুগের ইমামদের মতে, প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদীসও মারফূ এবং সহীহ হাদীসের মতো গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে আবূ দাউদ রহ.-এর এ হাদীসটির শুদ্ধতার পক্ষে সকল ইমাম, এমনকি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি স্বীয় মনগড়া বক্তব্যকে প্রমাণের জন্য ইবরাহীম নাখয়ী রহ.-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, ‘মহিলাগণ পুরুষদের মতোই নামায আদায় করবে’। এ উক্তি উল্লেখ করে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ ঐ গ্রন্থের কোথাও এ কথাটি নেই। এমনকি ‘মাকতায়ে শামেলার’ হাজার হাজার কিতাব সার্চ করেও এ উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দীনের নামে এমন জালিয়াতির কোনো অর্থ হয় না।

তৃতীয় পর্যায়ে উম্মে দারদা রা. সম্পর্কে বর্ণিত একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, ‘তিনি নামাযে পুরুষের ন্যায় বসতেন’। আলবানী সাহেব যদিও এ উক্তি দ্বারা নিজের দাবি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আসলে এ উক্তি দ্বারা পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হয়ে থাকলে ‘উম্মে দারদা পুরুষের মতো বসতেন’-একথা বলার প্রয়োজন কী? যেহেতু উম্মে দারদা মহিলাদের নামাযে বসার প্রচলিত ও সাধারণ নিয়মের উল্টা করে পুরুষদের মতো বসতেন, (যা ছিলো একটি ব্যতিক্রম) তাই একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বুখারী রহ.-এর ‘তারীখে সগীরে’ এটি স্থান করে নিয়েছে।

এছাড়াও আহলে হাদীস ভাইয়েরা নিজেদের উদ্ভাবিত আরো কিছু যুক্তি পেশ করে থাকেন, যেগুলোর দুর্বলতা দীনের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউ বুঝতে সক্ষম। তাই সেসব বিষয়ের অবতারণা করা হলো না।

আহলে হাদীস ভাইগণ পুরুষ-মহিলাদের অনেক ইবাদাতে পার্থক্য মানেন, যেগুলোর ভিত্তি মহিলাদের সতর ঢাকার উপর। যেমন, ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ, অথচ মহিলাদের জন্য মাথা ঢেকে রাখা

ফরয। পুরুষগণ উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন, অথচ মহিলাদের জন্য নিম্নস্বরে তালবিয়া পড়া জরুরি। আযান-ইক্বামাত-ইমামতি পুরুষদের জন্য খাস, মহিলাদের জন্য এগুলোর হুকুম নেই। এছাড়া আরো অনেক ইবাদাতে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য সবাই মেনে আসছে। তাহলে নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য মানতে তাদের সমস্যা কোথায়? এ পার্থক্য তো আমাদের মনগড়া কোনো বিষয় নয়। সরাসরি হাদীস ও আসারে সাহাবা থেকে প্রমাণিত। আহলে হাদীস বন্ধুরা একদিকে হাদীস মানার দাবি করছে, আবার অন্যদিকে হাদীসের উল্টা কাজ করছে। কী আজব বৈপরিত্য!

মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুরুষদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ! শরী'আত কী বলে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণনায় মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান:

(ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত হুজরায় নামায পড়া অপেক্ষা তার ঘরে নামায পড়া উত্তম, আর ঘরে নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কুঠুরিতে নামায পড়া উত্তম। (সুনানে আবূ দাউদ, হা. নং ৫৭০)

(খ) একদা হযরত উম্মে হুমাইদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসি। রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসো। কিন্তু তোমার ঘরে নামায, তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায, তোমার বাড়িতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়িতে নামায, তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে

নামায, আমার মসজিদে আমার সাথে নামায অপেক্ষা উত্তম'। তারপর থেকে তিনি নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করিয়ে নিলেন এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করলেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৭১, হা. নং ২৬৯৬৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা হা. নং ১৬৮৯ ও সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫/৫৯৫, হা. নং ২২১৭)

(গ) হযরত উম্মে সালামা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গৃহাভ্যন্তরই হলো মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ। (মুসনাদে আহমাদ হা. নং ২৬৫৯৮)

উপর্যুক্ত সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে,

ক. মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের নিজ গৃহকোণ মসজিদ অপেক্ষা উত্তম।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীতটা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ হতেই পারে না।

বি.দ্র.: হাদীসের কয়েকটি বর্ণনা, যেগুলো মহিলাদের মসজিদে আসা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় সেগুলো প্রাথমিক যুগের কথা। তখন পুরুষরাও সকল মাসআলা জানতো না। সে সময় কয়েকটি কঠিন শর্ত-সহকারে রাতের আঁধারে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে একদম পিছনের কাতারে মহিলাদের দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই অনুমতি প্রত্যাহার করে তাদেরকে ঘরে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক যুগের ঐ সকল হাদীস দ্বারা বর্তমানে মহিলাদের মসজিদে গমন জায়িয বলা যাবে না।

মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবীদের উক্তি

(ক) সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারিণী ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ নারী আলেম আম্মাজান হযরত আয়িশা রা. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দেখতেন যে, মহিলারা সাজ-সজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোষাক পরিধানে (মুসলিম শরীফের টীকা দ্রষ্টব্য) কী পন্থা উদ্ভাবন করেছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (সহীহ বুখারী হা. নং ৮৬৯, সহীহ মুসলিম হা. নং ৪৪৫)

(খ) হযরত আমর শাইবানী রহ. বলেন, আমি এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্বাহবিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দিতেন এবং বলতেন, 'তোমরা নিজ ঘরে চলে যাও, তোমাদের জন্য উহাই উত্তম'। হাদীসটি ইমাম তাবারানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (মু'জামুল কাবীর তবারানী: ৯/২৯৪, হা. নং ৯৪৭৫)

এ হলো নবীযুগের পর-পরই অবস্থার পরিবর্তনের দরুণ মসজিদে গমনকারিণী মহিলাদের প্রতি হযরত আয়িশা রা.-এর উক্তি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর আমল। যদিও তখনকার মহিলারা ছিলেন সাহাবী অথবা তাবেঈ, অন্য কেউ নন। আজ চৌদ্দ শতাব্দি পরে মহিলাদের তেল, সাবান, শেম্পু সহ সকল প্রকার প্রসাধনী-ই সুগন্ধিযুক্ত। অধিকাংশ মহিলা পর্দাও করে না। আবার যারা বোরকা পরে তাদের অধিকাংশই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল চেহারাকে উন্মুক্ত রাখে এবং তাদের বোরকা ও পোশাক হয় নজরকাড়া ফ্যাশনের। এ অবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দিতেন এটা বিবেকবান কেউ কি কল্পনা করতে পারে?

মহিলাদের মসজিদে গমন: বিভিন্ন মাযহাবের সিদ্ধান্ত

ক. হানাফী মাযহাব: সকল মহিলার জন্য জামা'আত, জুমু'আ, ঈদ ও পুরুষদের মাহফিলে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: খণ্ড-২, পৃ. ১১৭২)

খ. মালেকী মাযহাব: অতিবৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আয় অংশগ্রহণ হারাম।

গ. শাফিঈ মাযহাব: অতিবৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আসহ যেকোনো জামা'আতে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। (আল ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ: খণ্ড-১, পৃ. ৩১১-১২)

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা যা পেলাম এর বিপরীতে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিক্বহী বর্ণনা নেই যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোনো যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সাওয়াবের কাজ ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবীগণ ও পরবর্তী ফিক্বাহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম সময়ে কী করে তা সাওয়াব ও আগ্রহের কাজ হতে পারে? যে সকল আলেম বা স্কলারগণ বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন, তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আয়িশা রা. ও ইবনে মাসঊদ রা. এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশী যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন? অথচ এ সকল স্কলার অসংখ্য বেগানা মহিলার চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইসলামী লেকচার প্রদান করেন, কিংবা লক্ষ লক্ষ বেগানা মহিলার তাকানার সুযোগ করে দিয়ে বিনা প্রয়োজনে নিজেকে উপস্থাপন করেন। আমরা জানি, সহীহ হাদীসের আলোকে এসবই নিষিদ্ধ। (দেখুন, সুনানে তিরমিযী হা. নং ২৭৮২, সুনানে আবূ দাউদ হা. নং ৪১১২) বাস্তব দীন ও ইসলামের ক্ষেত্রে এরা কীভাবে গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য হয়ে গেলেন?

মাসআলা ক. একই নামাযে জামা'আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে সকল পুরুষের সম্মুখে কিংবা পাশে কোনো মহিলা থাকবে, সে সকল পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী: ১ম খণ্ড, পৃ.৫৭৩, আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭)

একারণেই হারাম শরীফে পুরুষদের সম্মুখে ও পাশে দাঁড়ানো থেকে মহিলাদেরকে নিবৃত্ত করতে কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে।

মাসআলা খ. মসজিদের যে তলায় মহিলারা জামা'আতে অংশগ্রহণ করে তার উপর তলায় বরাবর স্থানের পিছনে যে সকল পুরুষ দাঁড়াবে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামীসহ দুররে মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭)

উল্লেখ্য যে, টার্মিনাল, জংশন, এয়ারপোর্ট ও মুসাফিরদের যাত্রা-বিরতির স্থানসমূহে, হাসপাতাল ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরী। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত এ প্রেক্ষিতেই; যেনো তাওয়াফ-সাঈ-এর জন্য আগমনকারিণী, যিয়ারত ইত্যাদির জন্য বাইরে গমনকারিণী ও ভ্রমণরত মহিলারা সময় হলে নামায পড়ে নিতে পারে। এসকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধারণত দেখা যায় না। কারণ তারা নিজেদের ঘরেই নামায পড়ে নেয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা হারামাইন শরীফাইনে আগন্তুক শরী'আতের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলাদের জামা'আতে হাজির হওয়া দেখে এসে নিজেদের আবাসিক এলাকার মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা রাখার দাবি তোলে। অথচ সকল বালিগ পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে শরীক হয়ে পড়া ওয়াজিব, এর জন্যও যে কিছু করণীয় আছে তা তারা চিন্তাও করে না। বিষয়টি এক প্রকার গোমরাহী, যা গভীরভাবে ভাবার দাবি রাখে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করার শরঈ বিধান

ইসলামের যে সকল বিষয় সূত্র পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং উম্মতের একটি বৃহৎ অংশ প্রত্যেক যুগে অবিচ্ছিন্নভাবে যে সকল আমলের ধারা চালু রেখেছে, সেগুলোর একটি হলো দু'আতে ওয়াসিলা ধরা, বা মাধ্যম গ্রহণ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। বিষয়টি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। মালেকী, হাম্বলী, শাফিঈ এবং মুতাআখখিরীন হানাফিয়্যাহগণ শরী'আতের দৃষ্টিতে তাওয়াসসুল বা ওয়াসিলা ধরাকে বৈধ

বলেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ওয়াসিলা গ্রহণকারীর প্রশংসা করেছেন। (দেখুন! সূরা ইসরা: আয়াত ৫৭)

নিম্নে বিষয়টির দলীলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

আভিধানিক অর্থে তাওয়াসসুল বা ওয়াসিলা: তাওয়াসসুল অর্থ তাকাররুব বা নৈকট্য লাভ, বলা হয় অমুক ব্যক্তি আ'মলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। কারো মাধ্যমে দু'আ করানোকেও তাওয়াসসুল বা ওয়াসিলা বলে। সূরা মায়িদার ৩৫নং আয়াতে ওয়াসিলা শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। (সূত্র: তাফসীরুল আলূসী: ৬/১২৪)

পারিভাষিক অর্থে ওয়াসিলা: আল্লাহর গুণবাচক নাম, বা কোনো নেক আমল, কিংবা আল্লাহর কোনো নেক বান্দাকে দু'আর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানানো, অর্থাৎ এভাবে দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! অমুক নেক আমল, বা অমুক নেক বান্দার ওয়াসিলায় আমার দু'আ কবূল করুন। (সূত্র: তুহফাতুল ক্বারী: ৩/৩৩৭)

দু'আর মধ্যে মাধ্যম/ওয়াসিলা ধরার চারটি পদ্ধতি মৌলিকভাবে পাওয়া যায়। যথা-

1.التوسل باسماء الله تعالى و صفاته

'আল্লাহর সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নামের দ্বারা ওয়াসিলা ধরা'। অর্থাৎ, এভাবে দু'আ করা যে, **اسألك بكل اسم سميت به نفسك** সকল ফুক্বাহা এ পদ্ধতিটিকে জায়েয বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকো (প্রার্থনা করো) ।' (সূরা আ'রাফ: ১৮০, আরও দেখুন! মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৪৬, হা. নং ৩৭১২)

2.التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة

'দু'আর মধ্যে ঈমান ও নেক আমলের ওয়াসিলা ধরা'। অর্থাৎ, এভাবে দু'আ করা: 'আমার অমুক নেক আমলের ওয়াসিলায় আমার দু'আ কবূল করো'।

তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ব্যাপারেও সকল উলামা ও ফুক্বাহা ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন।

কোনো কোনো মুফাসসিরীনের মতে কুরআনের সূরা মায়িদা-৩৫ ও সূরা ইসরা-৫৭ নং আয়াতে ব্যবহৃত ওয়াসিলা শব্দটি উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন ব্যক্তির পাহাড়ের গর্তে আটকে পড়ার ঘটনা-সম্বলিত হাদীসটিও নেক আমলের মাধ্যমে ওয়াসিলা ধরার একটি দলীল। বুখারীতে ইবনে উমর রা. থেকে হাদীসটি পাঁচ জায়গায় এবং মুসলিমে এক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে- হাদীস নং ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম: ২৭৪৩।

3.التوسل بالنبى او الصلحاء فى الحيوة الدنيا.

'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াসিলা ধরা, বা আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবদ্দশায় তাদের ওয়াসিলা ধরা'।

'তাদের মাধ্যমে দু'আ করানো, বা তাদের ওয়াসিলায় দু'আ করা' উভয় সূরতই বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতি তাওয়াতুর বা 'প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত' দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান ও মুহাব্বত এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি মুহাব্বতের ওয়াসিলা ধরে দু'আ করাও উলামায়ে কিরামের নিকট জায়িয। অর্থাৎ, এভাবে দু'আ করা: **اسألك بنبيك محمد** আর উদ্দেশ্য নেয়া **اسألك بإيمانى به وبمحبته** এক্ষেত্রে সলফেদের মধ্যে কোনো মতভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.ও এ পদ্ধতিকে বৈধ বলেছেন। (দলীলের জন্য দেখুন, সূরা নিসা: ৬৪, তিরমিযী: ৩৫৭৮, বুখারী: ১০১০)

4. التوسل بالنبى ا والصلحاء بذاتهم بعد وفاتهم

'ইন্তিকালের পর নবীদের অথবা নেক বান্দাদের সত্তার ওয়াসিলা গ্রহণ করা'। অর্থাৎ, এভাবে দু'আ করা যে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ أَوْ بِجَاهِ نَبِيِّكَ أَوْ بِحَقِّ نَبِيِّكَ

এবং তাদের সত্তার ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা। তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতির ব্যাপারে অধিকাংশ ফুক্বাহা, অর্থাৎ মালেকী, শাফিঈ, হাম্বলী এবং মুতাআখখিরীনে হানাফিয়্যাহগণের অভিমত হলো: এভাবে তাওয়াসসুল জায়িয, যেভাবে জীবিতাবস্থায়ও জায়িয। (সূত্র: শরহুল মাওয়াহিব: ১২/১৯৪, আল মাজমূ': ৮/২৭৪, আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া: ১/২৬৬, ফাতহুল ক্বাদীর: ৮/৪৯৮, ইবনে আবিদীন: ৬/৩৯৭)

শেষোক্ত তাওয়াসসুলের বিষয়ে যেহেতু সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা মতভেদ করে থাকে, তাই জমহুরে উলামায়ে কিরাম যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে এটাকে জায়িয বলেন তা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের সাথে তুলে ধরা হলো:

1.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য ওয়াসিলা সন্ধান করো'। (সূরা মায়িদা: ৩৫)

বর্ণিত আয়াতে ওয়াসিলা দ্বারা التوسل بالذات والأعمال অর্থাৎ, সত্তা এবং আমল উভয়টির ওয়াসিলা উদ্দেশ্য। কারণ 'ওয়াসিলা' অর্থগতভাবে উভয়টাকে ধারণ করে। ফাতহুল বারীর বর্ণনা দ্বারাও একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, **وسيلة** শব্দটি সত্তার মাধ্যমে ওয়াসিলা ধরে দু'আ করাকেও বুঝায়।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বুখারীর ১০১ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, অন্য বর্ণনাতে اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. (হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াসিলা ধরে দু'আ করতাম। আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন...)-এর সাথে **اتخذوه وسيلة إلى الله.** অংশটিও আছে। অর্থাৎ, আব্বাস রা.কে তোমরা আল্লাহর নৈকট্যের ওয়াসিলা বা মাধ্যম বানাও। সুতরাং উক্ত হাদীসের প্রথম অংশে **وسيلة** দু'আ চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হলেও **اتخذوه وسيلة** অংশে সত্তার ওয়াসিলা গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে বর্ণিত সূরা মায়িদার আয়াতের মধ্যেও ওয়াসিলা শব্দটি

উভয় অর্থকে শামিল করেছে, যা উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (সূত্র: ফাতহুল বারী: ৬/১১)

2.وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا.

'যদিও পূর্বে এরা কাফিরদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় প্রার্থনা করতো' (সূরা বাক্বারা: ৮৯)

এ আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, ইয়াহুদীদের কাছে যখন কোনো বিষয় কঠিন হয়ে দাঁড়াতো তখন তারা দু'আ করতো:

اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِى نَجِدُ صِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! শেষ যামানায় আগমনকারী নবীর ওয়াসিলায় আমাদেরকে সাহায্য করো, যার গুণাবলী আমরা তাওরাতে পেয়েছি।' ফলে তাদের দু'আ কবূল করা হতো। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আসার পূর্বেই তার ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা হতো এবং তা কবূল হতো।

পবিত্র কুরআনে তাদের এ কর্মের সমালোচনা ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং 'এ আয়াত তাওয়াসসুলের স্পষ্ট দলীল' বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৩. اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، الخ (বুখারী হা. নং ১০১০)

আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে **كنا** শব্দটি একটি চলমান কাজকে বুঝায়। এ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, উমর রা. বলেন: হে আল্লাহ! আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করতাম, আপনি কবূল করতেন.....। (বুখারী হা. নং ১০১০)

অতএব, আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে হাদীসটি এ অর্থ প্রকাশ করছে যে, সাহাবায়ে কিরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তার ইন্তিকালের পর তার ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর খলীফা ছিলেন আবূ বকর রা.। তারপর উমর রা.-এর খিলাফত পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসিলা

দিয়ে দু'আ করা হতো- হাদীসটি দ্বারা একথাই বুঝাচ্ছে। 'ওয়াসিলা ধরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশার সাথে সীমিত'-এমন কোনো কথা বর্ণিত হাদীসটিতে নেই। তবে আহলে হাদীস বন্ধুরা দাবী করে থাকে যে, "উক্ত হাদীসে আব্বাস রা.-এর ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা হয়েছে, কারণ তিনি জীবিত ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা হয়নি, যেহেতু তার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল"। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, উক্ত বর্ণনায় সুক্ষ্মভাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা হয়েছে। দু'আর বাক্যটি ছিলো :

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا .....ألخ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার ওয়াসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি'। হাদীসের বাক্যটি দ্বারা 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ক্বারাবাত' বা আত্মীয়তা সম্পর্কের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা' বুঝাচ্ছে। দু'আর মধ্যে একথা বলা হয়নি যে, আব্বাস রা.-এর ওয়াসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি। বরং বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার ওয়াসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা সম্পর্কের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করার অর্থই হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা। সুতরাং এখানে 'তার মৃত্যুর পর ওয়াসিলা দেয়া নিষেধ'-এমন কোনো প্রমাণ নেই। উপরন্তু ওয়াসিলা জায়িয হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট হাদীস সামনে পেশ করা হচ্ছে:

حديث مالك الدار: قَالَ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا...ألخ

أخرجه البيهقى و بطريقه أخرجه التقى السبكى فى شفاء السقاح وأخرجه البخارى فى تاريخه بطريق أبى صالح ذكوان، وأخرجه ابن خيثمة، أخرجه أيضا ابن أبى شيبة باسناد صحيح كما نص عليه ابن حجر

অর্থ: ‘মালেক আদ্দার রা. থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকালে মুসলমানগণ বৃষ্টি খরার শিকার হয়েছিলো। একব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা‘আলার কাছে উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, তারা-তো বৃষ্টি খরায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে...।’ (ফাতহুল বারী: ২/৬১১)

হাদীস বিশারদদের ইমাম ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে তার ইন্তেকালের পর বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনাকারী ছিলো বিলাল বিন হারেস। কোনো সাহাবী থেকে এ কাজের বিরোধিতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করা কুরআন-হাদীস অস্বীকার করার নামান্তর। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের তাওয়াসসুলের শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম তাদের পরবর্তীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর তার তাওয়াসসুল গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي..... فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ.....أخرجه الترمذى-3578 وقال: هذا حديث حسن غريب.

أخرجه البخارى فى تاريخه ألكبير و ابن فى صلاة الحاجة والنسائى فى عمل اليوم والليلة، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة والبيهقى فى دلائل النبوة و غيرهم على اختلاف يسير فى غير موضوع الاستشهاد, وصححه جماعة من الحفاظ يقارب عددهم خمسة عشر حافظا فمنهم سوى المتأخرين الترمذى وابن حبان والحاكم والطبرى وابونعيم والبيهقى والمنذرى.

অর্থ: ‘উসমান বিন হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত, চক্ষুরোগে আক্রান্ত একব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, আমার সুস্থতার জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করুন... নবীজি সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুন্দরভাবে উযূ করতে বললেন এবং এ দু‘আটি পড়তে বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াসিলায় আপনার প্রতি ধাবিত হচ্ছি...’ (তিরমিযী হা.নং ৩৫৭৮)

বর্ণিত হাদীসে অনুপস্থিতির সম্বোধন/গায়েবানা সম্বোধনের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তার ওয়াসিলা দিয়ে দু‘আ করা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশার সাথে খাস না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

হাদীসের বর্ণনাকারী ‘উসমান বিন হুনাইফ রা.ও উক্ত হাদীসের এই অর্থই বুঝেছেন যে, ওয়াসিলা ধরা নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশার সাথে খাস নয়। তার (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পরও তার সত্তার ওয়াসিলা গ্রহণ করা যাবে। তাবারানী শরীফে আছে:

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَمَنِ خِلاَفَتِه, حَاجَةٍ لَهُ , فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ , وَلاَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِه , فَشَكَا ذَلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ, فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: " ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ... ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي... فَقَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ , مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الخ

اخرجه الطبرانى فى معجم الصغير:183/1, والبيهقى من طريقين واسنادهما صحيح,

والهيثمى فى مجمع الزوائد واقره عليه كما اقر المنذرى قبله فى الترغيب.

অর্থ: ‘উসমান বিন আফফান রা.-এর খিলাফত-যুগে একব্যক্তি তার কাছে একটি প্রয়োজনে বার বার যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি কোনো কারণবশতঃ তার দিকে ভ্র-ক্ষেপ করছিলেন না এবং তার প্রয়োজনও পুরা করছিলেন না। তাই সে ‘উসমান বিন হুনাইফ রা.-এর কাছে শিকাআত করলো। ‘উসমান বিন হুনাইফ রা. তাকে বললেন, ভালোভাবে উযূ করো, অতঃপর এই বলে দু‘আ করো: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াসিলায় আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছি...’ (তাবারানী সগীর: ১/১৮৩)

প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ আহলে হাদীস আলেম আল্লামা মুবারাকপুরী রহ. লিখেছেন: শায়েখ আব্দুল গনি ‘ইনজাহুল হাজাহ’ কিতাবে শায়েখ আবেদ সিন্ধির সূত্রে লিখেছেন যে, হাদীসুল আ’মা (অর্থাৎ, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিখানো ওয়াসিলা দিয়ে দু‘আ করার হাদীসটি) নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল জায়িয হওয়া বুঝায় এবং ‘উসমান বিন হুনাইফের তা’লীমের হাদীসটি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তার সত্তার তাওয়াসসুল জায়েয হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লামা শাওকানী তুহফাতুয যাকেরীনে বলেছেন, ‘উসমান বিন হুনাইফ রা.-এর তা’লীমের হাদীসটি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল জায়িয হওয়ার উপর দলীল। শর্ত হলো, এ বিশ্বাস রেখে দু‘আ করতে হবে যে, করনেওয়ালা যাত আল্লাহ তা‘আলা। (তুহফাতুল আহওয়াযী: ১০/২৭)

৬. স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্ববর্তী নবীগণের ওয়াসিলা দিয়ে দু‘আ করেছেন, যারা দুনিয়া থেকে অনেক পূর্বেই ইন্তেকাল করে গেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اخرجه الطبرانى فى الكبيروالاوسط كما فىمجمع الزوائد للهيثمى:257/9

অর্থ: ‘আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদের মাগফেরাত করুন এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমার পূর্বে গত নবীগণের ওয়াসিলায় তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন... (আল মু’জামুল কাবীর তবারানী: ২৪/৩৫৯, হা. নং ৮৭১; আল মু’জামুল আওসাত তবারানী: ১/৬৭, হা. নং ১৮৯)

৭. নবী আ. ও আম্বিয়া আ.-এর ইন্তেকালের পর তাদের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করার বিষয়টি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা পাঠক সমাজের সামনে অন্যান্যদের ওয়াসিলায় দু'আ করার একটি দলীল পেশ করছি:

وفى سنن ابن ماجه فى باب المشى إلى الصلاة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ....قال الشيح زاهد الكوثرى:لاتنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة الاحتجاج به بل يدور أمره بين الصحة والحسن لكثرة المتابعات والشوهد كماأشرنا إليها, وقد حسن هذا الحديث الحافظان العراقى فى تخريج الأحياء وابن حجر فى أمالى الأذكار.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়; অতঃপর বলে, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের ওয়াসিলায়...' (ইবনে মাজাহ্ হা. নং ৭৭৮)

বর্ণিত হাদীসটি সাধারণ এবং বিশেষ সব ধরনের লোকের ওয়াসিলা গ্রহণের বৈধতার প্রমাণ বহন করে।

বি.দ্র.: ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়াতে তিন ধরনের তাওয়াসসুলের আলোচনা করেছেন। যথা- ১. التوسل بالإيمان به وبطاعته

'নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এবং তার আনুগত্যের ওয়াসিলা দিয়ে দু'আ করা'।

২. التوسل بمعنى دعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم

'তাওয়াসসুল অর্থাৎ, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দু'আ এবং শাফা'আত প্রার্থনা করা'। ইবনে তাইমিয়া রহ. এ দুই প্রকারের ব্যাপারে বলেছেন, উলামায়ে কিরামের ঐক্যমত্যে এ উভয় প্রকার জায়িয।

৩. التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته صلى الله عليه وسلم

‘তাওয়াসসুল অর্থাৎ, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তার কসম দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করা’ (মাজমূ‘আতুল ফাতাওয়া: ১/১০৬)

বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেছেন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. যে তাওয়াসসুলকে না-জায়িয বলেছেন সেটা হলো: التوسل بمعنى الاقسام على الله بغير أسمائه

‘তাওয়াসসুল অর্থাৎ, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো নামে কসম দিয়ে দু‘আ করা’। আর এ প্রকারের তাওয়াসসুলকে আমরাও না-জায়িয বলি। কিন্তু তাওয়াসসুল যদি উক্ত পদ্ধতিতে না হয় তাহলে সেটা জায়িয হবে। (ফায়যুল বারী: ৩/১০৫)

উল্লেখ্য, কেউ যদি এ বিশ্বাস নিয়ে দু‘আ করে যে, ‘আমার মতো গুনাহগারের আল্লাহর কাছে সারাসরি চাওয়ার যোগ্যতা কোথায়? তাই আমি আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে চাই’; মাজারপূজারী, বিদ‘আতী ইত্যাদি সম্প্রদায় যেটা করে থাকে। তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম।

তদ্রুপ, কোনো বুযূর্গের কবরে গিয়ে তার কাছে অনুরোধ করা যে, ‘তিনি যেনো তার জন্য আল্লাহর কাছে তার কোনো প্রয়োজন পূরণের দু‘আ করেন’- তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতিটিও না-জায়িয। (ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম: পৃ. ৪৯-৬০)

(আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন: ফাতহুল বারী: ২/৬১০, তুহফাতুল ক্বারী: ৩/৩৩৭-৩৩৯, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৫/৩১৬-৩১৯, ফয়যুল বারী: ৩/১০৫, তুহফাতুল আহওয়াযী: ১০/২৫-৩১, মাকালাতুল কাওসারী: ৩৩৯-৩৫৬, মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ: ১৪/১৪৯-১৬৪)

এক মাজলিসে বা একসাথে তিন তালাকের শরঈ বিধান

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে এক মাজলিসে বা একসাথে তিন তালাক দেয় তাহলে কয় তালাক পতিত হবে, এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ আছে। যথা-

১. শি'আদের শাখা জা'ফরীদের মাযহাব হলো: এর দ্বারা কোনো তালাক হবে না। যেহেতু সালাফে সালেহীনের কারো থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়নি, তাই এ মাযহাব বাতিল। এ নিয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মলহীম: ১/১১১, ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ: ১৭/৯)

২. কোনো কোনো আহলে জাহের এবং ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর মাযহাব হলো: এর দ্বারা এক তালাক হবে, যদিও তালাক দাতা তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মলহীম: ১/১১৫)

৩. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর, আলী, 'উসমান, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আমর, উবাদাহ বিন সামিত, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আসেম বিন উমর ও হযরত আয়িশা রা.-সহ আরো অনেক সাহাবী এবং ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী রহ.-সহ অধিকাংশ তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের মাযহাব হলো: এক মাজলিসে বা একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং অন্যত্র বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে মেলামেশা না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না।

তৃতীয় মাযহাবের দলীল

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! বলে দিন, যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও...। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দিবেন' (সূরা তালাক: ১-২)

এ আয়াতে তালাকের শরঈ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, এমনভাবে তালাক দেয়া যার পরে ইদ্দত আসে এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য না রেখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। কেননা যদি তালাক না হয়, তাহলে সে নিজের উপর জুলুমকারীও হবে না এবং স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার পথও বন্ধ হবে না;

যেদিকে এ আয়াত ইশারা করছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দিবেন"। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে পথ বের করার অর্থ হলো ফেরত নেয়ার সুযোগ থাকা, যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. একব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দিলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাকে বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানী করেছো, তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বায়েনা হয়ে গেছে। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করোনি যে, আল্লাহ তোমার জন্য কোনো পথ বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন"। (ই'লাউস সুনান: ৭/৭০৮, আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী: ৭/৫৪২, হা. নং ১৪৯৪৪)

৩. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো। অতঃপর ঐ মহিলা অন্যজনকে বিবাহ করলে সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেকি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, 'না। যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী প্রথমজনের মতো ঐ মহিলার মধু আস্বাদন না করবে', অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (সহীহ বুখারী: ৫২৬১)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এটা রিফা'আ বিন ওয়াহাবের ঘটনা- যে তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছিলো, এটাই স্পষ্ট। রিফা'আ আল কুরাযীর ঘটনা নয়, যে তার স্ত্রীকে সর্বশেষ তালাক দিয়েছিলো। যে ব্যক্তি উক্ত দু'জনকে এক মনে করেছে, সে ভুল করেছে। ভুলের উৎস হলো, তালাকপ্রাপ্তা উভয় মহিলাকেই আব্দুর রহমান বিন জাবীর রা. বিবাহ করেছিলেন। (ফাতহুল বারী: ৯/৫৮১)

৪. হযরত উয়াইমির রা. লি'আনের পর বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার স্ত্রীকে রাখি তাহলে তার উপর মিথ্যারোপ করেছি'। একথা বলে তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। (বুখারী: ৫২৫৯)

আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. বলেন, কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখান থেকে উম্মত এটাই বুঝেছে যে, একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়, যদি উম্মতের এ বুঝ সহীহ না হতো তাহলে সঠিকটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বলে দিতেন। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মলহীম: ১/১১২, ই’লাউস সুনান: ৭/৭০৬)

৫. হযরত হাসান বিন আলী রা. তার স্ত্রী আয়িশা বিনতে ফযলকে একসাথে তিন তালাক দিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীর আবেগময় কথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, যদি আমি নানাকে (অন্য বর্ণনায় তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন) একথা বলতে না শুনতাম, “কোনোব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে ঐ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না বসা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না”- তাহলে অবশ্যই তাকে ফেরত নিতাম । (সুনানে বাইহাকী হা. নং ১৪৯৭১)

৬. মাহমূদ বিন লাবীদ রা. হতে বর্ণিত, একব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে যান। (নাসাঈ হা. নং ৩৪৩১) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাগান্বিত হওয়াই তিন তালাক হয়ে যাওয়ার প্রমাণ। কেননা, একসাথে তিন তালাক দেয়া গুনাহের কাজ। এ গুনাহের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারাজ হয়েছিলেন।

৭. হযরত ইবনে উমর রা. তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। এ হাদীসের শেষে আছে যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিতাম তাহলে কি তাকে ফেরত নিতে পারতাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তখন তো সে তোমার থেকে বায়েন (সম্পূর্ণ পৃথক) হয়ে যেতো এবং তোমার গুনাহ হতো। (সুনানে দারাকুতনী হা. নং ৩৯২৯)

৮. ওয়াকে বিন সাহবান রা. বলেন যে, ইমরান বিন হাসীন রা.কে একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীকে এক মাজলিসে তিন তালাক

দিয়েছে। ইমরান রা. উত্তর দিলেন, সে তার প্রতিপালকের নাফরমানি করেছে এবং তার জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. নং ১৮০৮৮)

৯. হযরত উমর রা.-এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে তার স্ত্রীকে একহাজার তালাক দিয়েছে; আর সে বলছে, এর দ্বারা আমি খেল-তামাশা করেছি। হযরত উমর রা. তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, একহাজার থেকে তোমার জন্য তিনটিই যথেষ্ট হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. নং ১১৩৪০, সুনানে বাইহাকী হা. নং ১৪৯৫৭)

১০. মুহাম্মাদ বিন ইয়াছ রহ., ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরাইরা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গ্রামের একলোক তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তিন তালাক দিয়েছে। এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? ইবনে আব্বাস রা. আবূ হুরাইরা রা.কে বললেন, আপনার কাছে একটি জটিল মাসআলা এসেছে, আপনি এর সমাধান দিন। আবূ হুরাইরা রা. বললেন, এক তালাক তাকে বায়েন করে দিয়েছে আর তিন তালাক তাকে হারাম করে দিয়েছে, যতোক্ষণ না সে অন্যজনকে বিবাহ করে। ইবনে আব্বাস রা.ও অনুরূপ উত্তর দেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক হা. নং ৬৫৯)

এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো। এছাড়া সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ থেকে আরো অনেক হাদীস ও ফাতাওয়া আছে, যেগুলো পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো: ‘তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে, লা-মাযহাবী ভাইদের মতানুযায়ী তিন তালাকে এক তালাক হবে না’।

ইজমায়ে উম্মাত

১.হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন, ‘জেনে রাখো! কোনো সাহাবা, কোনো তাবেঈ ও সালফে সালেহীনের মধ্যে যাদের কথা হালাল-হারাম ও ফাতাওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয়, তাদের কারো থেকে এ ধরনের সুস্পষ্ট কথা বর্ণিত

হয়নি যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক ধরা হবে'। (ই'লাউস সুনান: ৭/৭১০)

২. ইবনে তাইমিয়া রহ. (যিনি এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদের শেষ উক্তি এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত। (ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ: ১৭/৮)

৩. ইবনুল কাইয়্যিম রহ. (তিনিও এক তালাকের প্রবক্তা) বলেন, 'এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দিলে তালাক হওয়ার ব্যাপারে চারটি মাযহাব আছে। (ক) তিন তালাকই হয়ে যাবে, এটা চার ইমাম, অধিকাংশ তাবেঈ ও সাহাবার মাযহাব...।' (লাজনাতুত দায়িমাহ-এর উদ্ধৃতিতে আহসানুল ফাতাওয়া: ৫/৩৬৬)

এছাড়াও হাফেজ ইবনুল হুমাম ফাতহুল ক্বদীরে, ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে, ইমাম তহাবী শরহু মাআনিল আসারে, আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কুরআনে, আবূল ওয়ালীদ বাজী আল-মুনতাকাতে, ইবনুল হাদী সিয়ারুল হাসসি ফী ইলমিত তালাকে, আল্লামা যুরকানী শরহে মুআত্তায়, ইবনুততীন শরহে বুখারীতে, ইবনে হাযাম জহেরী মুহাল্লাতে, আল্লামা খত্তাবী শরহে সুনানে আবূ দাউদে, হাফেয ইবনে আব্দুল বার তামহীদ ও ইস্তিযকারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হযরত উমর রা.-এর যুগে একই মাজলিসে তিন তালাকে তিন তালাক হওয়ার উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'সাহাবীগণের ইজমা দলীল হওয়ার বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে মতৈক্য কায়েম হয়েছে।' (ফতহুল বারী: ১৩/২৬৬)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'মাশায়েখ ও ইমামগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে ইজমা কায়েম হলে তা অকাট্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে'। (উমদাতুল আসাস: পৃ. ৪২)

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া রহ. বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের আমলের পর আর কারো কথা মেনে নেয়া হবে না।’ (এগাসাতুল লাহফান: পৃ. ১৯২)

৪. চার ইমামের মাযহাবের বিপরীত যা আছে, তা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী, যদিও তাতে অন্যদের দ্বিমত থাকে। (আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের : পৃ.১৬৯)

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, **এক মাজলিসে বা একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে; এক তালাক নয়।**

২য় মাযহাবের দলীল ও তার জবাব

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, হযরত রুকানা রা. তার স্ত্রীকে এক মাজলিসে তিন তালাক দিলেন এবং পরে তিনি খুব মর্মাহত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কীভাবে তালাক দিয়েছো? তিনি বললেন, আমি তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এক মাজলিসে দিয়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা এক তালাক, যদি চাও তাহলে তাকে ফিরিয়ে নাও। (মুসনাদে আহমাদ: ২৩৯১)

জবাব: এ ঘটনার বর্ণনায় ভিন্নতা পাওয়া যায়। এখানে আছে যে, তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন। আর আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনায় আছে যে, ‘বাত্তাহ’ শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছেন। এ দুই ধরনের বর্ণনার কারণে ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসকে ‘মা‘লূল’ বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার রহ. এ হাদীসকে যঈফ বলেছেন। (আত-তালখীসুল হাবীর: ১৬০৩)

ইমাম জাসসাস ও ইবনে হুমাম রহ. মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাকে ‘মুনকার’ বলেছেন। (তাকমিলাহ: ১/১১৫)

ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইমাম আবূ দাউদ রহ. ‘বাত্তাহ’ শব্দ দ্বারা তালাক দেয়াকে রাজেহ বলেছেন। কোনো বর্ণনাকারী এটাকেই তিন তালাক বুঝে

সেভাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে ইবনে আব্বাস (রা)-এর পরবর্তী হাদীস দ্বারাও দলীল দেয়া যাবে না। (ফাতহুল বারী: ৯/৪৫৪, তাকমিলাহ: ১/১১৫)

২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে, আবূ বকর রা.-এর যুগে ও খিলাফতে উমর রা.-এর প্রথম দুই বছর (অন্য বর্ণনায় তিন বছর) তিন তালাক এক তালাক ছিলো। অতঃপর হযরত উমর রা. বলেন, লোকেরা এমন বিষয়ে তাড়াহুড়া করছে, যে বিষয়ে তাদের অবকাশ ছিলো। হায়! যদি আমি তাদের উপর তা কার্যকর করতাম। অতঃপর তিনি তা কার্যকর করলেন। (মুসলিম: ৩৬৫৪)

জবাব: ক. হাফেজ আবূ যুরআহ রহ. বলেন, এ হাদীসের অর্থ হলো, বর্তমানে লোকদের একসাথে তিন তালাক দেয়ার যে প্রচলন দেখা যাচ্ছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, আবূ বকর রা.-এর যুগে ও খিলাফতে উমর রা.-এর প্রথম দুই বছরে ছিলো না। তখন লোকেরা সুন্নাত তরীকায় তিন তুহুরে তিন তালাক দিতেন। (সুনানে বাইহাকী: ১৪৯৮৪)

খ. আর যদি হাদীসের অর্থ এই হয় যে, একসাথে তিন তালাক দিলে বর্তমানে তিন তালাক ধরা হবে, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, আবূ বকর রা.-এর যুগে ও খিলাফতে উমর রা.-এর প্রথম দুই বছর তা এক তালাক ধরা হতো। তাহলে এর উত্তর হলো: এ মাযহাবের দুটি হাদীস, উভয়টি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। অথচ তার ফাতাওয়া হলো, একসাথে বা এক মাজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়। যা দলীল নং ২ ও ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কত্তান, আহমাদ বিন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীর মতো বড় বড় মুহাদ্দিসীনের মাযহাব হলো, যখন কোনো রাবী তার হাদীসের বিপরীত আমল করেন বা ফাতাওয়া দেন, তখন তার বর্ণিত হাদীসটি আমলযোগ্য থাকে না। সুতরাং ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসদ্বয়ও আমলের যোগ্য নয়; বিভিন্ন আপত্তির কারণে তা অগ্রহণযোগ্য। (ই’লাউস সুনান : ৭/৭১৬)

গ. এ হাদীস একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন- যদি কোনোব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো, তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক এবং বিচারকের সামনে দাবী করতো যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলে প্রথমটির তাকিদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো; ভিন্ন তালাক উদ্দেশ্য ছিলো না, তাহলে কাযী তার দাবি কবূল করতেন এবং তার কথাকে বিশ্বাস করে এক তালাকের ফাতাওয়া দিতেন। কিন্তু হযরত উমর রা.-এর যুগে লোকজন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের দীনদারী কমতে থাকে, তখন হযরত উমর রা. বিচার ব্যবস্থায় এ ধরনের দাবি কবূল না করার আইন র্কাযকর করেন এবং ঐ শব্দ দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেন, তথা তিন তালাক হওয়ার ফাতাওয়া কার্যকর করেন। (তাকমিলাহ: ১/১১৪, ফাতহুল বারী: ৯/৪৫৬)

যদি তাই না হতো এবং উমর রা.-এর এ সিদ্ধান্ত শরী'আতে মুহাম্মাদীর বিপরীত হতো, তাহলে ইবনে আব্বাস রা.-সহ সকল সাহাবায়ে কিরাম কখনোই তা মেনে নিতেন না। যেমন- উম্মে ওলাদকে বিক্রি করা, এক দিনারকে দুই দিনারের মাধ্যমে বিক্রি করা, এবং হজ্জে তামাত্তু-এর মাসআলায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. স্পষ্ট-ভাষায় হযরত উমর রা.-এর বিরোধিতা করেছেন। (আহসানুল ফাতাওয়া: ৫/৩৬৯)

যদি কেউ বলে যে, হযরত উমর রা.-এর ভয়ে সাহাবীরা তার প্রতিবাদ করেনি (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক), তাহলে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে এরূপ ধারণা পুরা দীনকে ভিত্তিহীন করে দিবে, যা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, কারো জন্য এ ধারণা করা জায়েয নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী'আত পরিপন্থী কোনো বিষয়ের উপরে একমত হয়েছেন। **(মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া: ১৭/২২)**

সর্বশেষ কথা: আমাদের গাইরে-মুকাল্লিদ বন্ধুদেরকে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা মদীনার আমল দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। সৌদি সরকার মক্কা-মদীনাসহ সে দেশের বড় বড় উলামাদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে এ মাসআলার তাহকীক পেশ করার নির্দেশ দেয়। তারা দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ

সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একসাথে বা এক মাজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। (এঘটনা আহসানুল ফাতাওয়ার ৫ম খণ্ডের ২২৫-৩৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে) । এক্ষেত্রে তাদের জবাব কী হবে?

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক মেনে নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরয

১. হযরত নুমান বিন বাশীর রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'শুনে রাখো! নিশ্চয়ই শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে যখন তা সুস্থ থাকে তখন গোটা শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা রোগাক্রান্ত থাকে তখন গোটা শরীরই অসুস্থ থাকে। শুনে রাখো! সেই গোশতের টুকরা হলো কলব তথা আত্মা'। (বুখারী হা. নং ৫২, হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ।)

২. হযরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাকো এবং নিজের পাপের জন্য কাঁদো '। (তিরমিযী হা.নং ২৪০৬)

৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'যখন আদম সন্তান ভোরে ওঠে, তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকবো। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়বো'। (তিরমিযী হা.নং ২৪০৭)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে তখন এর দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার নিকট থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়'। (তিরমিযী হা. নং ১৯৭২)

৫. হযরত আয়িশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, সাফিয়্যা সম্পর্কে আপনাকে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ এইরূপ। তিনি একথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘যদি তোমার এ কথাকে সমুদ্রে মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে এটা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দিবে’। (আবূ দাউদ হা. নং ৪৮৭৫)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না, যা রক্ষা করতে পারবে না’। (তিরমিযী হা.নং ১৯৯৫)

৭. হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা বদ-ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্ট মিথ্যা। তোমরা আড়ি পেতো না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও’। (বুখারী হা.নং ৫১৪৩)

৮. হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে’। (আবূ দাউদ হা.নং ৮৯০৩)

৯. হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থেকো। কেননা জুলুম ক্বিয়ামতের দিন বহুমুখী অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা লোভ এবং কৃপণতা থেকে বেঁচে থেকো। কেননা লোভ ও কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। লোভ ও কৃপণতার বশবর্তী হয়ে তারা পরস্পর রক্তপাত করেছে এবং নিজেদের উপর হারাম বস্তুকে হালাল করেছে’। (মুসলিম হা.নং ২৫৭৮)

১০. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের নেক আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আর যে ব্যক্তি এজন্য লোক-সম্মুখে নিজের নেক আমল প্রকাশ করে যে, মানুষ তাকে মহৎ মনে করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার অন্তরের অবস্থা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিবেন’। (বুখারী হা.নং ৬৪৯৯)

১১. হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ‘রাগ করো না’। সে কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করলো, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন যে, ‘তুমি রাগ করো না’। (বুখারী হা. নং ৬১১৬)

১২. হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারলেই বীর হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত বীর হলো ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে’। (বুখারী হা.নং ৬১১৪)

১৩. হযরত বাহায ইবনে হাকীম রা. তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনভাবে ‘ছাবীর’ মধুকে বিনষ্ট করে দেয়’ (ছাবীর এক প্রকার তিতা ফল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তা পাওয়া যায়) । (তিরমিযী হা. নং ৮২৯৪)

১৪. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোসসা দমন করে রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার উপর থেকে আযাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহপাক তার ওযর কবূল করেন’। (শুআবূল ঈমান বাইহাকী হা. নং ৭৯৫৯)

১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এমন কোনোব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে। পক্ষান্তরে, এমন কোনোব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে’। (মুসলিম হা.নং ৯১)

১৬. হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ব্যক্তি এদের কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে দোযখে ঢুকাবো। অপর একটি বর্ণনায় আছে, তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করবো’। (মুসলিম হা. নং ২৬২০)

১৭. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, অবশেষে তার নাম উদ্ধত-অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তার উপর সেই আযাবই নেমে আসে, যা তাদের উপর নেমে থাকে’। (তিরমিযী হা.নং ২০০০)

১৮. হযরত আবূ সাঈদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলি এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে, এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও এব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি ইয়াহুদ ও নাসারা! তিনি বললেন, তবে আর কারা!?’ (বুখারী হা.নং ৩৪৫৬)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষের শরীরের মতো মানুষের অন্তরও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেসব রোগের একেকটি এতো বেশি ক্ষতিকর যে, একটি রোগই যেকোনো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা আত্মার রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا** ' যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে, সে সফলকাম হবে ' (সূরা শামস : আয়াত ৯)

এ আয়াতের তাফসীরে হাসান বসরী রহ. বলেন,

معناه: قد افلح من زكى نفسه فاصلحها و حملهاعلى طاعة الله . تفسير المظهرى10/247

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সফলকাম হবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে তথা আত্মাকে সংশোধন করাবে এবং আত্মাকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর উদ্বুদ্ধ করবে। (তাফসীরে মাজহারী: ১০/২৪৭)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাতে বলেছেন। বুঝা গেলো যে, আত্মা একা একা পরিশুদ্ধ হয় না, বরং কোনো আহলে দিল বুযূর্গের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করাতে হয় । তাই সাহাবায়ে কিরাম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নিজেদের আত্মার চিকিৎসা করিয়েছেন, পরিশুদ্ধ করিয়েছেন। নিজের আত্মার চিকিৎসা নিজে করেননি এবং এটা সম্ভবও নয়। শরীরের রোগের চিকিৎসার জন্য যেমনিভাবে আমরা ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে থাকি, ঠিক তেমনিভাবে আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য যারা আত্মার রোগের পরামর্শপত্র দেন তাদের দ্বারস্থ হতে হবে। হ্যাঁ! পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, **আত্মার রোগের চিকিৎসা করা ফরয, আর শরীরের রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত** । সুতরাং, আমাদের জন্য ফরয হলো: কোনো হক্কানী-রব্বানী নায়েবে নবীর মাধ্যমে নিজ আত্মার চিকিৎসা করানো।

যারা আত্মার রোগের চিকিৎসা না করেই মারা যাবে তাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: **وقد خاب من دسها** 'আর ব্যর্থকর্ম হবে সে, যে আত্মাকে (গুনাহের মধ্যে) ধ্বসিয়ে দিবে' (সূরা শামস: ১০) তাছাড়া, ১৮নং হাদীসেও তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহওয়ালাদের সুহবতে এসে আত্মার চিকিৎসা না করালে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়ে যাবে।

নিম্নবর্ণিত হাদীসে আত্মার রোগের চিকিৎসা না করার কারণে শহীদ, আলেম ও দানবীরদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে:

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ (ধর্ম-যুদ্ধে প্রাণদানকারী) । তাকে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে আনা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নিয়ামাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন; আর সেও তা (নিয়ামাত প্রাপ্তির কথা) স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তুমি এসব নিয়ামাতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কী আমল করেছো? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করোনি, বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছো যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে নিজে দীনী ইলম শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে, আর সে কুরআন শরীফও পড়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাকেও দুনিয়ার নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তুমি কী আমল করেছো? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অপরকেও তা শিখিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ পড়েছি। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্য ইলম শিখেছো যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়, আর এজন্য কুরআন পড়েছো যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা‘আলা সবধরণের ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান বানিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা

তাকে প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসমস্ত নিয়ামাতের বিনিময়ে তুমি আমার জন্য কী করেছো? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো তার একটিও আমি হাতছাড়া করিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্য দান করেছো, যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানা হবে। অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। (সহীহ মুসলিম হা.নং ১৯০৫)

আত্মার রোগের চিকিৎসা না করার কারণেই মূলত উপরিউক্ত শহীদ, আলেম ও দানবীরের এই করুণ পরিণতি হয়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত হলো, নিজ আত্মার চিকিৎসার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া; কোনো হক্কানী পীর বা শাইখকে নিজ আত্মার অবস্থা জানিয়ে আত্মার পরিশুদ্ধি করানো। আল্লাহ তা'আলা অমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাদীস নাকি সুন্নাহ: কোনটি অনুসরণ করবো?

অনেক সহীহ হাদীস রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে হাদীসের কিতাবের সকল হাদীস আমলযোগ্য নয়, শুধু যেসব হাদীস সুন্নাহ পর্যায়ের সেগুলোর উপর আমল করতে হবে, যার সারসংক্ষেপ হলো ফিক্বহের কিতাবসমূহ। এ সম্পর্কে কিছু হাদীস ও আসার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং আমীরের কথা শুনতে ও তার অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান! তোমরা দীনের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বাহিরে নতুন কথা থেকে বেঁচে থাকবে।

কেননা দীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ‘আত। (সুনানে দারেমী হা. নং ৯৬)

২. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে প্রিয় বৎস! যদি তুমি এভাবে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পারো যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা নেই, তবে তা করো। অতঃপর তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! এটা আমার সুন্নাহ। আর যে আমার সুন্নাহকে যিন্দা করলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (তিরমিযী হা. নং ২৬৮৩)

৩. হযরত মালেক রহ. থেকে বর্ণিত, তার নিকট পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দুটি আঁকড়ে ধরে রাখবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আর জিনিস দুটি হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা মালেক হা. নং ৬৮৫)

৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খাবে এবং সুন্নাহর উপর আমল করবে এবং যার অনিষ্ট থেকে সকল মানুষ নিরাপদ থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর একলোক বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল, এমন লোক তো আজকাল অনেক। হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এমন লোক থাকবে। (তিরমিযী হা. নং ২৫২৫)

৫. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিগণকে মানুষের অগোচরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তাদের কেউ বললেন, আমি মহিলাদের বিবাহ করবো না। কেউ বললেন, আমি আর গোশত খাবো না। আর কেউ বললেন, আমি আর বিছানায় ঘুমাবো না। অতঃপর নবী ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ছানা পড়লেন আর বললেন,

মানুষের কী হলো? তারা এমন এমন বলে! অথচ আমি নামায পড়ি ও ঘুমাই, নফল রোযা রাখি ও রোযা ছেড়ে দেই, এবং আমি মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম হা. নং ১৪০১)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ সমূহের এমন কোনো সুন্নাহকে যিন্দা করেছে যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিলো, তার জন্য সে সকল লোকের সাওয়াবের পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে যারা এর উপর আমল করবে। অথচ তাদের থেকে বিন্দু পরিমাণ সাওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর নতুন পথ আবিষ্কার করেছে যার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (‘আলাইহিস সালাম) রাজী নন, তার জন্য সে সকল লোকের গোনাহের পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যারা এর উপর আমল করবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। (তিরমিযী হা. নং ২৬৮২)

৭. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এ যমীনে তার ইবাদাত করা হবে। তবে ইবাদাত ব্যতীত তোমরা যেসব আমলকে ছোট মনে করো সেসব বিষয়ে তার আনুগত্য করা হবে, এ ব্যাপারে সে আশাবাদী। অতএব হে মানবসকল, সাবধান! আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১/৯৩)

৮. হযরত ইবনে হারেস ছুমালী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখনই কোনো জাতি একটি বিদ‘আত চালু করেছে তখনই একটি সুন্নাহকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা বিদ‘আত চালু করা থেকে উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ হা. নং ১৬৯৭২)

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি কাজের উত্থান রয়েছে। আর প্রতিটি উত্থানের একটি স্থিতিশীলতা রয়েছে। অতএব, যার উত্থান আমার সুন্নাহর দিকে হবে, সে সফলকাম। আর যার উত্থান আমার সুন্নাহ ব্যতিরেকে হবে, সে ধ্বংসিত। (ইবনে হিব্বান হা. নং ১১)

১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম তিন প্রকার। আয়াতে মুহকামার ইলম, সুন্নাতে কায়েমার ইলম এবং ফরীযায়ে আদেলার ইলম। এগুলো ব্যতীত সব অতিরিক্ত। (আবূ দাউদ হা. নং ২৮৮৫)

উপরে উল্লিখিত প্রতিটি হাদীসে সুন্নাহর অনুসরণের এবং তা আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়েছে। এধরণের হাদীস বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, যেখানে হাদীস অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কেননা হাদীস সুন্নাহ থেকে ব্যাপক। রহিত হাদীসসমূহ এবং নবী ‘আলাইহিস সালামের সাথে, বা কোনো সাহাবীর সাথে খাস হুকুম-সম্বলিত বর্ণনা হাদীস হলেও সুন্নাহ নয়। সুন্নাহ হলো নবী ‘আলাইহিস সালাম উম্মতের অনুসরণের জন্য যা রেখে গেছেন এবং যা রহিত হয়নি। এজন্য নাজাতপ্রাপ্ত দলের নাম রাখা হয়েছে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ’। অর্থাৎ, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে সাহাবায়ে কিরামের জামা‘আতের মাধ্যমে অনুসরণ করে।

কোন হাদীস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত আর কোনটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয় তা হক্কানী উলামাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করে জনগণের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং উলামায়ে কিরাম থেকে না বুঝে একা একা হাদীস রিসার্চ করে আমল করা মারাত্মক গোমরাহী। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে হিফাজত করুন। আমীন।